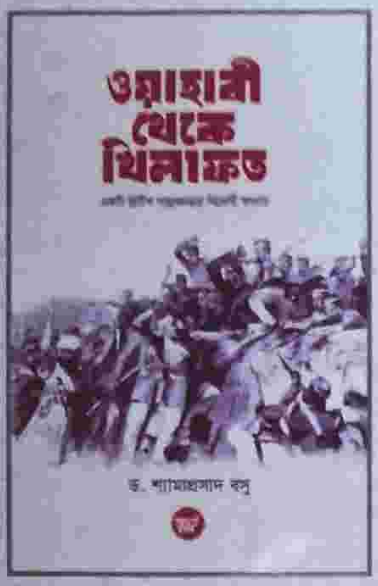
ওয়াহাবী থেকে খিলাফত

একটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অধ্যায়



ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু

আদর্শ লিপি



ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের মধ্যে যে কয়েকটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাদের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন, আলিগড় আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন নিশ্চিতভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এদের মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত আন্দোলন সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আর আলীগড় আন্দোলন ছিল এ দুটি আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রগতিশীল শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবজাগৃতির এক উদ্দীপক সূচনা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই তিনটি আন্দোলনের মধ্যে এক যোগসূত্র খোঁজার প্রয়াস পেয়েছেন। একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক বিরাট সম্ভাবনার কথাও তিনি তুলে ধরেছেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

Click here
to join our channel



ওয়াহাবী থেকে খিলাফত

একটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ
বিরোধী অধ্যায়



ওয়াহাবী থেকে খিলাফত

একটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ
বিরোধী অধ্যায়

ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু

আদর্শলিপি

Click here
to join our channel



ওয়াহাবী থেকে খিলাফত

(একটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অধ্যায়)

লেখক : শ্যামাপ্রসাদ বসু

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৮১

পঞ্চম সংস্করণ
(আদর্শলিপি প্রথম) : জুলাই ২০২৪

প্রকাশক : জিয়াউল হক জুয়েল
আদর্শলিপি প্রকাশন
বি-৩৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম
শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-২৫৪
এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন
ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৮৪০৯৫৩৯৫৪
০১৭৩৩৭৭৩৩৩৭

Wahabi Theke Khilafat
by Dr. Shyamaprasad Basu

Published by **Adarshalipi**
B-35, Concord Emporium
Shopping Complex
253-254 Elephant Road
Kantabon, Dhaka-1205

e-mail : adarshalipi2018@gmail.com
website : www.adarshalipi.com
Phone : 01840953954
01733773337

ISBN : 978-984-34-7964-8

Price : BDT 260

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের উত্তরসূরিবৃন্দ

প্রকাশনা : ১৭ (সতেরো)
অক্ষরবিন্যাস : জিয়াউল হক জুয়েল
পরিমার্জন : কাজী আরিফ ও
জিয়াউল হক জুয়েল
প্রচ্ছদ : আল-নোমান
মূল্য : ২৬০ টাকা

Click here
to join our channel

নিমাইলাল দত্ত
বন্ধুবরেষু

ও

রাজীব বসু এবং সুজিত ঘোষ
অনুজপ্রতিমেষু

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ওয়াহাবী থেকে খিলাফত : একটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অধ্যায়' বইটি ১৯৮১ সালে প্রথম সংস্করণ বেরোবার মাত্র আটমাসের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। অথচ নিছক অর্থাভাবে বইটির কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র পত্র-পত্রিকাদিতে সমালোচনা ছাড়া। প্রথম প্রকাশের সময়ে যথেষ্ট আশঙ্কা এবং কুণ্ঠা ছিল-প্রধানত বিষয়বস্তুর বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে। কিন্তু সুখের বিষয় ইতিহাসজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষ উভয়েই বইটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী যেমন এই বইটির মধ্যে 'ইতিহাসের গতিচ্ছন্দের মধ্যে একটি মূলধারা অন্বেষণের প্রবৃত্তি' দেখে খুশি হয়েছেন তেমনি অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায় আশ্বস্ত হয়েছেন সাধারণ ইতিহাস সচেতন মানুষ– যা তাঁর ভাষায় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ– তাঁরা চিন্তা করার মতো একটি ব্যাখ্যা পাবেন। অপরদিকে 'সত্যযুগ' এবং 'গণশক্তি' এই বইটিকে যথাক্রমে 'মূল্যবান' এবং 'অসামান্য' বলে স্বীকৃতি দিলেও 'জিজ্ঞাসা' এবং 'আজকাল' কাগজের ভাষ্যকারদের মতে এই বইয়ের ব্যাখ্যা আন্দোলনগুলির 'সাম্প্রদায়িক' চরিত্রকে নস্যাৎ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত ভাষ্যকারেরা আন্দোলনের যে তথ্যগত রেখাচিত্র এই ছোট্ট বইতে আঁকা হয়েছে তার কোনো ভুল-ভ্রান্তি দেখাননি। তাঁরা কেবল রায় দিয়েছেন।

যাইহোক, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে এধরণের পরস্পর বিরোধী মতামত অনিবার্য– তবে ইতিহাসবিদের কর্তব্য এর থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেহেতু এটি শিল্প সংক্রান্ত কোনো

শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তির ঘটনা নয়– তাই ইতিহাসবিদের পক্ষে কোনো দেওয়া নেওয়া করে আপসের ফর্মুলায় আসা সম্ভব নয়। তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যদি জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে তা সত্য হয় (যেমন, আওরঙজেবের "হিন্দুবিদ্বেষ" সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার এবং ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার) তাহলে একজন বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাকারীর কাছে সেটি শুধু সত্য নয় আরো 'বেশিগুণ' জরুরী। শুধু নিছক পূর্বপ্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত বলে বাতিল করা যাবে না।

নতুন সংস্করণের সুযোগ নিয়ে আলোচ্য বিষয়গুলির যুক্তিজালকে আরো বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছি। যে সমস্ত মন্তব্য সীমিত বাক্য বিন্যাসে কিছুটা অস্পষ্ট ছিল বলে মনে হয়েছে সেগুলিকে আরো সুস্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছি।

উনিশ শতকের মহান পুরুষদের সম্পর্কে এই বইতে প্রকাশিত মন্তব্যে কেউ কেউ ক্ষোভ এবং উষ্মা প্রকাশ করেছেন। ওইসব মহান পুরুষদের সুবিশাল কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও একটি কথা অবশ্যই স্মর্তব্য যে তাঁরা কেউই ইতিহাস বিচ্ছিন্ন মানুষ ছিলেন না। তাই সীমাবদ্ধতাও স্বাভাবিক।

কিছু কিছু আরবি বুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে কোনো কোনো সমালোচক ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাই নতুন সংস্করণে ওইসব শব্দের যথাসম্ভব প্রচলিত বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করেছি। অবশ্য এইসব ভিন্ন মতের সারবত্তা স্বীকার করে নিলেও তার দ্বারা আন্দোলনের যে ব্যাখ্যাগুলি বর্তমান বইতে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেগুলির তাৎপর্য উপলব্ধিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। আর ভিন্নমতের প্রকার ভেদও অনেকটা সেই 'পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য' 'আজকাল' কাগজে (২৭ জুন, ১৯৮২), জনৈক বাহারউদ্দিনের সমালোচনার। 'খিলাফত' ও 'ফরাজি' শব্দের অর্থ উদ্ধার ও বিশ্লেষণে বর্তমান লেখকের 'ব্যর্থতা' প্রমাণে সমালোচক সোচ্চার। তাঁর মতে : 'আরবি অভিধান বলে খিলাফত শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব লেখক বলেছেন কথাটির অর্থ উত্তরাধিকারী।' তেহরাণ থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'The shorter, Persian-English Dictionary'-এর ২৭১ পৃষ্ঠায় 'খিলাফত'কে আরবি শব্দ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার

ইংরেজি অর্থ লেখা হয়েছে 'Succession'। আর 'Succession' শব্দটির বাংলা অর্থ সংসদ প্রকাশিত ১৯৭৭ সালের English-Bengali Dictionary-র ১১১২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'উত্তরাধিকারী হওয়া'। আবার 'All about Khilafat' বইতে সুস্পষ্টভাবে 'Successor' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত সংসদ অভিধানেও লেখা আছে (পৃ. ১৪৭) 'a successor of Mohammed'. অনুরূপভাবে ফরাজি শব্দের মূল হিসেবে বহুবচনে আমি যেখানে 'ফরাইজ' কথাটির উল্লেখ করেছি সেখানে তিনি বলেছেন একবচনে ফরজ। সমস্ত লেখাটিতে শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিয়ে সমালোচক ম'শায় যতটা নিজের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন– তার সিকিভাগও তিনি আন্দোলনগুলির ব্যাখ্যা সম্পর্কে করেননি। মনে হয় ইতিহাস তাঁর চৌকিদারির ভয়ে শেষ পর্যন্ত ভাষার বেড়া ডিঙিয়ে সমালোচনার অঙ্গনে ঢুকতে পারেনি। আর তিনি বোধহয় তাতেই খুশি– তাই একলাইনেই ব্যর্থতার রায় দিয়ে ফেলেছেন! আসলে ইতিহাসের সমালোচনা ইতিহাসবিদকে দিয়েই করাতে হয়– নইলে বিতর্কে হয়তো পয়েন্ট জেতা যায়, সমালোচনা হয় না। একটা কথা মনে রাখা দরকার, মূল আরব ভূখণ্ডে ওই সব শব্দগুলি প্রাথমিক ভাবে যে অর্থ বহন করেই থাকুক না কেন ভারত ভূখণ্ডে তা আমদানি হওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। যা ছিল নিছক ধর্ম সংক্রান্ত তাই রূপান্তরিত হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়।

কোনো কোনো সমালোচক প্রবন্ধগুলির ক্ষেত্রে আরো কিছু অনুল্লেখিত রেফারেন্স পুস্তকের কথা বলেছেন। একথা সত্য সমস্ত বই আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি বা সেক্ষেত্রে কারুরই বোধহয় সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে বিষয়বস্তুর উপর নিত্য নতুন বই বেরোচ্ছে। ওই সব সমালোচকদের কাছে আমার নিবেদন যে তাঁদের পঠিত বই কি বর্তমান লেখকের উল্লিখিত তথ্যগুলিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে পেরেছে? বোধ হয় না। তাঁদের সমালোচনা থেকে অন্তত সে রকম কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তথ্য-প্রমাদ ঘটলে নিশ্চয় তা সংশোধন করে নেবো।

সবশেষে একটা জিনিষ বলে রাখা ভালো বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা

মানেই, একপেশে ইতিহাস বা তথ্যের বিকৃতি নয়– প্রকৃত সত্যের সারধর্ম উদ্ধার, যা'একান্তই কাম্য জাতীয় প্রগতির স্বার্থে।

'নবজাতক প্রকাশন'-এর জনাব মজহারুল ইসলাম স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এগিয়ে না এলে বইয়ের এত দ্রুত নতুন সংস্করণ বেরোত কিনা সন্দেহ। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সেইসব অসংখ্য সমালোচকদের যাঁদের প্রশংসা-অপ্রশংসা আমার চিন্তার ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃত করার সুযোগ দিয়েছে। এই বইয়ের নতুন সংস্করণটি তুলে দিলাম আমার কন্যা কৌশাম্বী ও উজ্জয়িনী এবং ভাগ্নি দেবলীনা ও মিতালির হাতে।

শ্যামাপ্রসাদ বসু
২ আগষ্ট '৮২
আমলাপাড়া, পুরুলিয়া

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কবি লিখেছেন, 'পলাশীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইবের খঞ্জর'। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারালো। ক্লাইভের খঞ্জর মীরমদন আর মোহনলালের মধ্যে তফাত করলো না। রচিত হলো হিন্দু-মুসলমানের মেল-বন্ধন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালের জাতীয় স্বাধীনতার লড়াইতে উভয় সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া নেতারা এই মেল-বন্ধনকে একবারে ছিন্ন না করলেও দৃঢ় করতে ব্যর্থ হলেন। ফলশ্রুতি– বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং চূড়ান্ত পরিণতি খণ্ডিত উপমহাদেশ। কিন্তু তাতেও এই কর্কট রোগের উপশম ঘটেনি। মূলের বিষ কখনোই উৎখাত হয়নি। খণ্ডিতকরণ কেবল সাময়িক নিরাময়ের তাৎপর্য বহন করে এনেছিল।

'কি হতে পারত', সে কথা যেমন একজন ইতিহাস অনুসন্ধানকারীর বিষয়, তেমনি 'কি ঘটেছিল' সেদিন দেশের ইতিহাসে তার সঠিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণও তাঁর বিচারের আওতায় পড়ে। বিশ্বের কোনো কিছু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র নয়। সবার মধ্যেই এক ঘনিষ্ট যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ইতিহাসের যে-কোনো অধ্যায় তখনকার নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেটি অতীতের বিভিন্ন অবস্থার ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ সেই অধ্যায়কে তার সঠিকরূপে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে। কিন্তু একই সাথে স্মরণ রাখা প্রয়োজন জগতের পরিবর্তন যেমন আসে পরস্পর বিরোধী শক্তির অবস্থান ও সংঘাতের ভেতর দিয়ে, তেমনি পরিবর্তনশীল ইতিহাসের মধ্যেও আছে বিরোধের অস্তিত্ব এবং সামাজিক প্রগতির মূলে রয়েছে সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। সাধারণভাবে উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণি

সম্পর্ক সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তির জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কখনোই ইতিহাস পরিবর্তনের একমাত্র সত্য নয়। যদিও এর গুরুত্ব অসীম। কারণ সেক্ষেত্রে মনোজগতের রূপান্তর স্বল্পগুরুত্বের হলেও তাকে একেবারে উপেক্ষা করলে যান্ত্রিক অর্থনৈতিক সর্বস্বতার চোরাবালিতে ডুবে যেতে হবে। মানসিক পরিবর্তন আসে ধীরে ধীরে, নবীন-প্রাচীনের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। সেটা বাস্তবজীবনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মত সুনির্দিষ্টভাবে ঘটে না। এরই সঙ্গে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা বা নেতৃত্বটিও বিশ্লেষণের আওতায় আসে। নেতা কোনো সময়েই তাঁর কালের উৎপাদনের ভিত্তিতে যে শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার থেকে তিনি কোনো বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা নন। তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও সামাজিক নেতৃত্বের মধ্যে শ্রেণির প্রভাব পড়তে বাধ্য– যদিও তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

বৈজ্ঞানিক যেমন জড় জগতে একটি মূল সূত্র সন্ধান করেন তেমনি ইতিহাস অনুসন্ধানকারীও রাজনৈতিক জীবনের বিকাশের মধ্যে একটা মূলসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। অবশ্য ঘটনার যথাযথ বর্ণনাও তাঁর কাছে গৌণ নয়। 'ওয়াহাবী থেকে খিলাফত' শিরোনামের বইটিতে যে তিনটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যেও একটি মূলসূত্র সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং একইভাবে তদানীন্তন ইতিহাসের ঘটনাবলির মধ্যে দ্বান্দ্বিক দিকটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে।

'ওয়াহাবী' প্রবন্ধটির ক্ষেত্রে আমি কোনো 'প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা' দিইনি, তার কারণ এর ঘটনাবলি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত এবং প্রধান-গ্রন্থগুলির সাথেও বেশিরভাগ পাঠকের পরিচয় আছে। অন্য দু'টি প্রবন্ধের 'প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা'র প্রতি আমি পাঠকদের সযত্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মূলের নির্দেশিকা ব্যতীত ও আরো কিছু ঘটনার সংযোজন আছে।

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলির পুরো বা আংশিক যাঁরা পড়েছেন তাঁরা হলেন, শ্রীনির্মাল্য আচার্য্য, জনাব আবদুর রশিদ, শ্রীতুষারকান্তি বসু, শ্রীশংকর মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবিনয় ঘোষ এবং শ্রীসুশান্ত হাজরা। এঁদের

মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ। তবে এই প্রবন্ধগুলিতে যেসব মতামত প্রকাশ পেয়েছে তার দায়িত্ব এঁদের নয়।

বিখ্যাত চিত্র পরিচালক, কবি ও শিল্পী শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে যেভাবে শুধু অনুরোধে সাড়া দিয়ে এ বইয়ের 'কভার' এঁকে দিয়েছেন, তা এক দৃষ্টান্ত বিশেষ। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বইয়ের প্রকাশনার ব্যাপারে অধ্যাপক রাসবিহারী দত্ত সোৎসাহে এগিয়ে না এলে এত তাড়াতাড়ি এই বই বেরোত কিনা সন্দেহ। এই তরুণ বন্ধুকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পরিশেষে, যে সমস্ত ইতিহাসখ্যাত চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে, তাঁদের নানা ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাঁরা বরেণ্য এবং তাঁদের আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

শ্যামাপ্রসাদ বসু
১ মার্চ '৮১
আমলাপাড়া, পুরুলিয়া

সূচিপত্র

ওয়াহাবী আন্দোলন	১৫-৩৮
আলিগড় আন্দোলন	৩৯-৬৯
খিলাফত আন্দোলন	৭০-১০১

ওয়াহাবী আন্দোলন

উনিশ শতকের শুরু থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাপে ভারতে মুসলমানেরা তাদের পাঁচশো বছরের রাজনৈতিক প্রভুত্ব হারাতে বসলেন। আধুনিক মারণাস্ত্রের কাছে পুরোনো রণকৌশল অচল হয়ে গেল। ইংরেজরা ক্রমশ ভারতের মানচিত্রকে গ্রাস করে ফেলল। মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রভাব প্রতিপত্তি বিপন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। সরকারি সম্মান, কাজ সব লুপ্ত হলো। এমনকি এতদিনের রাজভাষা ফারসিকেও বিদায় দেওয়া হলো সরকারি কাজকর্ম থেকে।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দের নতুন আইনে ফারসির আসনে বসানো হলো ইংরেজি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে। মুসলমানদের উঁচু মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তাঁদের মনে হলো সরকারি কাজ থেকে বঞ্চিত করে বিদেশিরা শুধু রুটি-রুজির উপর আঘাত হানছে তাই নয়, অন্যদিকে এতদিনের ঐশ্বর্যময় ভাষাকেও করছে অসম্মান।

ইতিমধ্যে অভিজাত মুসলমানদের হাতে যে সব নিষ্কর জমি ছিল তা ইংরেজরা ক্রমশ কেড়ে নিতে লাগল। আর অন্যদিকে মুসলমান রাজস্ব কর্মচারী ও কাজীর বদলে ইংরেজ কালেকটার ও বিচারপতি নিযুক্ত হলো।

বিদ্যালয় ও সরকারি কাজের যাবতীয় ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইংরেজরা এদেশের প্রভু। মুসলমানরা তাদের অধীনে সামান্য প্রজা মাত্র। ফলে স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে একটা দারুন ক্ষোভ বিদ্বেষ জমা হতে লাগল। এই ক্ষোভ, হতাশা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ দেখা দিলো ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে—ব্রিটিশ বিরোধী এক সশস্ত্র বিক্ষোভে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের নামে ওয়াহাবী আন্দোলন পরিচিত। অষ্টাদশ

শতকের চল্লিশ দশকে সৌদি আরবের 'নজে' (Nejd) তিনি এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। ওয়াহাবী শব্দের অর্থ নবজাগরণ। আবদুল ওয়াহাব প্রচারিত তত্ত্বের মূলকথা ছিল সৃষ্টিকর্তা এক, কুরআন ও হাদিসকে সকলের ব্যাখ্যা করার অধিকার এবং প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন ও আইনের চারটি ধারাকে অগ্রাহ্য করা। প্রধান লক্ষ্য—পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর সময়ের সহজ সরল ধর্মানুচরণে প্রত্যাবর্তন এবং সব রকমের ইসলাম বিরোধী ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণা।

ভারতে যদিও তাঁর শিষ্যরা ওয়াহাবী নামে কোনো সংস্থা গঠন করেননি তবুও তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ সংস্কারকদের আমরা ওয়াহাবী বলেই জানি।

এদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন কিছুটা স্বতন্ত্ররূপে পরিস্ফুট। ধর্মের সংস্কারের সাথে সাথে দিল্লির মাওলানা শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ (১৭০৩-৬২) সাধারণের বৈষয়িক উন্নতি ও কিছুটা অস্পষ্টভাবে ধনতন্ত্র বিরোধী মতবাদ প্রচার করেন।

ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতে শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের তিরিশ দশকে। যদিও লক্ষ্য করা যায় ওয়াহাবী মতবাদ উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে এই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজী শরিয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরায়েজি সম্প্রদায় গঠন করেন। ফরায়েজি শব্দটি মূল আরবি 'ফরাইজ' থেকে এসেছে—যার অর্থ হলো ইসলাম নির্দিষ্ট 'বাধ্যতামূলক কর্তব্য'।

'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম' থেকে জানা যায় শরিয়ত উল্লাহর জন্ম ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে। আঠারো বছর বয়সে মক্কায় হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে ওয়াহাবী নেতাদের সংস্পর্শে এসে ওয়াহাবী মতে দীক্ষিত হন। মক্কায় বিশ বছর অতিবাহিত করেন। সাফী সম্প্রদায়ের গুরু শেখ তাহিরের তত্ত্বাবধানে তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি স্ব-গ্রামে নিজের মতবাদ প্রচারে প্রয়াসী হন।

তাঁর মতবাদের মূলকথা ভারতে বিদেশি শাসন মুসলমানদের পক্ষে নিরাপদ নয়। সুতরাং শুক্রবারের ইবাদত ও ঈদের উৎসব করাও বাধ্যতামূলক কর্তব্য নয়। পির এবং মুরিদ শব্দ দুটি যেহেতু প্রভু-ভক্তের সম্পর্ক প্রকাশ করে তাই এই দুটি শব্দের বদলে 'ওস্তাদ' (শিক্ষক) ও 'সাগরেদ' (ছাত্র) ব্যবহার করা হলো। এর তাৎপর্য কেবলমাত্র প্রভুর প্রতি অন্ধ ভক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে শিক্ষকের নিকট

ছাত্রের যুক্তিনির্ভর আনুগত্য। অতীত অপরাধের জন্য অনুতাপের (তওবা) উপর জোর দিলেন। অপরদিকে সাগরেদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য পবিত্র আচরণের কথা বললেন। ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে কুরআন অনুযায়ী একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ফরায়েজিদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

বলাবাহুল্য এতে ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ধনী মুসলমানরা শরিয়ত উল্লাহর উপর ক্রুদ্ধ হলেও নিম্ন শ্রেণির কৃষক, কলু, তাঁতি প্রভৃতি হাজার হাজার মুসলমানরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এক সময়ে ফরিদপুরের জমিদার ও ধনী মুসলমানরা একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁর প্রচার প্রধানত ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জমিদার শ্রেণির আক্রোশের কারণ শরিয়ত উল্লাহ'র অর্থনৈতিক বক্তব্য। তাঁর মতে জমিদার শ্রেণি ইংরেজের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দরিদ্র রায়তদের রক্ত শোষণ করছে। পূর্ববাংলার অধিকাংশ চাষি ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। সুতরাং কৃষকরা তাঁর কথায় বিশেষ প্রভাবিত হয়। এছাড়া শরিয়ত উল্লাহর ব্যক্তিগত জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক এবং নিজেও জন্মেছিলেন সমাজের এক নিম্নবর্গে অর্থাৎ তাঁতির বাড়িতে।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ তাঁর গ্রামবাসীদের নিকট খুবই প্রিয় ছিলেন। বিপদের সময়ে তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন। দুঃখে দিতেন সান্ত্বনা, আনন্দে উৎসাহ। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে— তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত বাংলার কৃষকদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে তাঁদের মনে জাতীয় চেতনা আনতে সাহায্য করেছিলেন।

হাজী শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর আরদ্ধ কাজের ভার নিলেন পুত্র মহসীন আলদীন আহমদ বা দুদু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২)। বাল্যকালে তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে আরবি ও ফারসি ভাষার চর্চা করেন এবং বারো বছর বয়সে মক্কায় গমন করেন। কলকাতা হয়ে মক্কা যাওয়ার পথে তিনি তিতুমীরের গ্রামে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন। মক্কায় পাঁচ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি দেশে ফেরেন। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

তাঁর হাতে ফরায়েজি মতবাদ ধর্মের পরিবর্তে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে বেশি ঝুঁকল। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলো জমিদার ও নীলকর ইংরেজ সাহেবরা। দুদু মিঞা ঘোষণা করলেন—জমি হলো আল্লাহর সম্পত্তি। তাই জমিদারদের খাজনা কোনোভাবেই প্রাপ্য নয়। এর ফলে শুধু যে কৃষকরা

জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করল তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে বড়ো বড়ো নদীর চরে সরকারি জমিও তারা দখল করে বসে। দুদু মিঞার সংগঠন গড়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। বাহাদুরপুরকে কেন্দ্র করে সমগ্র পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি হল্কা বা অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রতি হল্কায় একজন করে ডেপুটি বা খলিফা নিযুক্ত করা হলো। খলিফাগণের কাজ ছিল ফরায়েজি-আদর্শ চাষিদের মধ্যে প্রচার করা এবং তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

দুদু মিঞা প্রয়োজনে জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামেরও আহ্বান জানান। তাঁর মতে জমিদার ও নীলকরদের শুধু শায়েস্তা করলে চলবে না— তাদের প্রধান খুঁটি ইংরেজ সরকারকে হঠাতে হবে। ঢাকা থেকে লোয়ার প্রোভিন্সেস-এর সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ডব্লিউ ডেমপিয়ার ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে তাঁর রিপোর্টে জানান যে, ফরায়েজিদের কাজকর্ম সুস্পষ্টভাবে ইংরেজ স্বার্থ-বিরোধী।

জমিদার ও নীলকরগণের চাপে কোম্পানি দুদু মিঞাকে বার বার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে এবং প্রতিবারই প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মোট চার বার তিনি গ্রেপ্তান হন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ, ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দ, ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ ও সবশেষে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময়ে তিনি আলিপুর জেলে বন্দি হন। বার বার কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। জেল থেকে মুক্তিলাভ করার অব্যবহিত পরে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

যদিও দুদু মিঞা তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনেক সময়ে অহেতুক বলপ্রয়োগ করেছেন তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি নির্যাতিত কৃষকদের নীরব ভাষাকে সরব করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে নিয়েছিলেন। জমিদারদের বেআইনি 'সেস', নীলকরদের অত্যাচার ও মহাজনদের শোষণের তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ যম।

দুদু মিঞার পর ফরায়েজি মতবাদ ক্রমশ বৃহত্তর ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ার ফলে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃত উদগাতা রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ শাহ (১৭৮৬-১৮৩১) ও শাহ ইসমাইল (১৭৮২-১৮৩১)। সৈয়দ আহমদ ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহের পুত্র শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য এবং শাহ ইসমাইল ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহের দৌহিত্র। ফলে দু-জনই শাহ ওয়ালিউল্লাহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

শাহ ইসমাইল এবং সৈয়দ আহম্মদ শাহ্ শুরুতে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে যে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন তাকে তাঁরা অভিহিত করেন "তারিকা -ই-মহম্মদীয়া" বলে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ প্রদর্শিত পথ। মূলত এই আন্দোলনের সাথে ওয়াহাবীদের প্রচারিত আরব দেশের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বা ফরায়েজিদের কথিত বিশুদ্ধ ইসলামি রীতিনীতি পালনের সাথে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। যেটুকু পার্থক্য তা সংখ্যাগত, গুণগত নয়। যেমন ফরায়েজিরা বাংলাদেশে জুম্মা ও ঈদের নামাজ আদায় বন্ধ রাখেন, অন্যদিকে 'তারিকা' পন্থিরা নামাজ আদায় করা ইসলাম পরিপন্থি বলে মনে করেননি। অপরদিকে ওয়াহাবীরা যেখানে 'হাম্বলী ব্যাখ্যা'কে গ্রহণ করেন সেখানে ফরায়েজিরা 'হানাফি ব্যাখ্যা'কে স্বীকার করেন। এ জাতীয় আরও কিছু পার্থক্য দেখিয়ে বর্তমানে কিছু ঐতিহাসিক সৈয়দ আহমদের আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলনরূপে অভিহিত করতে নারাজ। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্ট 'ওয়াহাবী মামলা'র উল্লেখ করেন। যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের 'ওয়াহাবী' বলতে আপত্তি জানিয়ে সৈয়দ আহমদকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন।

এর উত্তরে বলা যায়, এটা অতি স্বাভাবিক যে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি আরব দেশের গুরুকে নিজের গুরু বলে অতিরাষ্ট্রিক আনুগত্যের অভিযোগের বোঝা নিজের স্কন্ধে চাপাতে চাইবেন না। তাছাড়া, নাম বা আখ্যা যাই দেওয়া হোক না কেন ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার উপর ওয়াহাবীরা যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার থেকে বিন্দুমাত্র কম গুরুত্ব শাহ ইসমাইল ও সৈয়দ আহমদ আরোপ করেননি। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই যে, মক্কায় হজ করতে গিয়ে সৈয়দ আহমদ শাহ্ ওয়াহাবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আরব দেশে ওয়াহাবীপন্থিদের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই সৈয়দ আহমদ শাহ্, শাহ ইসমাইল এদেশে স্বাধীন সংস্কারমূলক মতবাদ প্রচার করেন। যদিও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূলত ছিল এক। রাজনৈতিক দিক থেকে মূল ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যটি লক্ষ্যণীয়। আরব দেশে আবদুল ওয়াহাবের আন্দোলন ছিল তুরস্ক আধিপত্যের বিরুদ্ধতা—অর্থাৎ সর্বশেষ বিশ্লেষণে বিদেশি শক্তির বিরোধিতা। এদেশেও কালক্রমে সৈয়দ আহমদ শাহের শিখদের বিরুদ্ধতার সাথে সাথে শেষ পর্যায়ে ইংরেজ-বিরোধিতা অর্থাৎ বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সুতরাং সৈয়দ আহমদ শাহের আন্দোলনকে জনপ্রিয় অর্থে ভারতে ওয়াহাবী বলে উল্লেখ করলে তত্ত্বের দিক থেকে মারাত্মক কোনো ভুল হবে বলে মনে হয় না। যদিও তথ্যগত কিছু কিছু গরমিল উভয় আন্দোলনের মধ্যে খোঁজা যেতে পারে।

সৈয়দ আহমদ শাহ্ জীবনের প্রথম কিছুকাল পিণ্ডারিদের অধীনে দস্যু-বৃত্তিতে কাটান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এ জাতীয় জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। অবশেষে দিল্লির ধর্মগুরু শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ'র সাধক শিষ্য আবদুল আজিজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অনেকাংশে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেন। তিন বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে মুসলমান ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করায় ব্রতী হন। অচিরেই সৈয়দ আহমদ শাহ একজন শক্তিশালী বক্তা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

সর্বপ্রথম উত্তর ভারতের রোহিলারা তাঁর মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৈয়দ আহমদ এতে উৎসাহিত হয়ে হজ যাত্রীদের একটি বিরাট দল গঠন করেন। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে এই বিরাট দলটি সৈয়দ আহমদ শাহ্কে সামনে রেখে রাজকীয় শোভাযাত্রা করে পাটনা হয়ে কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শোভাযাত্রা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে যাত্রীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পাটনায় এসে এই শোভাযাত্রা যখন কিছুদিনের জন্য থামল তখন দেখা গেল যাত্রী সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি ছোটো-খাটো সরকার গঠন করতে হলো। হাণ্টার তাঁর প্রসিদ্ধ বই *'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস'*-এ এর একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন।

শোভাযাত্রার পথের উপর অবস্থিত সমস্ত বড়ো বড়ো শহরের ব্যবসায়ীদের মুনাফা থেকে বিশেষ কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। পূর্বতন মুসলমান সম্রাটদের মতো তিনিও প্রাদেশিক শাসনকর্তার অনুরূপ চারজন বিভাগীয় খলিফা নিযুক্ত করেন। এইভাবে পাটনায় একটি স্থায়ীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি গঙ্গার তীর হয়ে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। যাওয়ার পথে বিভিন্ন শহরে নিজস্ব মনোনীত এক একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। কলকাতায় পদার্পণের সাথে সাথে তাঁর অনুগামীদের সংখ্যাও দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল। শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত আদর্শের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এ ধরনের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হলো। তার পরিবর্তে পাগড়ির কাপড় খুলে দেওয়া হলো। যে ওই কাপড় স্পর্শ করবে সেই শিষ্য বা অনুগামী হবে।

নতুন মতবাদ প্রচারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সৈয়দ আহমদ শাহ্ ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা পরিত্যাগ করে হজ যাত্রীর ন্যায় মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ শাহ ওয়াহাবী ভাবধারার সাথে পরিচিত হন। এ সময়ে চব্বিশ পরগণার মীর নিসার আলি বা তিতুমীর এবং ফরিদপুরের ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক দুদু মিঞার সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে। তিতুমীর সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সৈয়দ আহমদ শাহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বোম্বাইতে কয়েকদিন বাস করার পর তিনি বিভিন্ন শহর ও জেলা ঘুরে ঘুরে তাঁর মতবাদ প্রচার করা আরম্ভ করলেন। এরপর কলকাতায় পুনরায় ফিরে এসে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে একটি শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে পাটনা ও গোয়ালিয়র হয়ে বেরিলিতে ফিরে যান।

সৈয়দ আহমদের মতে, ইসলামি আদর্শের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করার ফলে মুসলমানদের আজ হীন অবস্থা। পয়ম্বগরের বাণী অনুসরণ করে ভারতীয় মুসলমানরা যদি জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন তবেই তাঁদের পুনরুজীবন ঘটবে। ভারতে বিদেশি শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এখন এটা "দার-উল-হারব" (শত্রুর দেশ)। মুসলমানদের কর্তব্য এই বিদেশি শাসন উৎখাত করা, না হয় এদেশ পরিত্যাগ করে যে দেশে 'দার-উল-ইসলাম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে-দেশে সপরিবারে চলে যাওয়া।

যদিও সৈয়দ আহমদ শাহ্ শিখ রাজ্যে মুসলমানদের নির্যাতনের অভিযোগ এনে শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তথাপি তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবেই ইংরেজ বিরোধী ছিল। কারণ বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর ভারতের যেখানে যেখানে তিনি এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন সে সমস্ত স্থানেই ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয়ে বসেছিল। অর্থাৎ ইংরেজদের জন্যই ভারতবর্ষ 'দার-উল-হারব'। তাদের বিতাড়িত না করলে ভারতবর্ষ 'দার-উল-ইসলাম' রাষ্ট্রে পরিণত হবে না।

সৈয়দ আহমদ শাহ্ ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য তাঁর অনুগামীদের কাছে সরাসরি আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন, ইংরেজ শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাহায্যের জন্য মারাঠা অধিনায়ক রাজা হিন্দুরাওয়ের কাছেও পত্র লেখেন। তাঁর পরামর্শে দুই

শিষ্য বিলায়েত আলি ও এনায়েত আলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওয়াহাবী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুসলিম যুবকগণকে নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। তাদের ইউরোপীয় কায়দায় লড়াই করার শিক্ষা দেওয়া হয়। হিজরত আদর্শ অনুযায়ী ওয়াহাবীগণ বিধর্মী ইংরেজ শাসিত ভারত ত্যাগ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠান অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটি হতে লড়াই করে ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার সংকল্প গ্রহণ করে। এখানে পাঠান উপজাতিদের সাহায্যে সৈয়দ আহমদ শাহ্ তাঁর শক্তি দৃঢ় করেন এবং পেশোয়ার জয় করেন।

সৈয়দ আহমদ শাহ্ এবং ওয়াহাবীগণ উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সামরিক শক্তিগঠন করলে প্রতিবেশী পাঞ্জাবের শিখ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁর অনিবার্যরূপে সংঘাত ঘটল। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে শিখদের হাতে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শাহ্ প্রাণ হারান ও ওয়াহাবীগণ পরাস্ত হয়।

শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। কারণ সৈয়দ আহমদের মূল আবেদন ছিল শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের অধিকার। ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন। বিহার ও বাংলাদেশের যেখানে যেখানে ওয়াহাবী আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল সেখানে সেখানে আগুন জ্বলে উঠল। এমনকি মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। হায়দ্রাবাদের নবাব মুবারিজউদদৌলাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ইংরেজরা গোলকুণ্ডার দুর্গে বন্দি করে। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেখানেই মারা যান। তাঁর দশজন প্রধান অনুগামীকেও দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

বাংলাদেশে এই সময়ে তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শাহ্-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীরের জন্ম হয়। পিতার নাম মীর হাসান আলী ও মাতার নাম ছিল আবেলা রোকেয়া খাতুন। বাল্য বয়সে মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন— আরবি, ফারসি, বাংলা ও অঙ্কশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। তিতুমীর বাংলার সাথে আরবি ও ফারসিতেও অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। ১৮২২ সালে তিনি মক্কা গমন করেন এবং সেখানে সৈয়দ আহমদ শাহের সাথে পরিচিত হন। দেশে ফিরে এসে প্রথমে সৈয়দ আহমদের অনুসরণে ধর্মসংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু অচিরেই ইংরেজ

কোম্পানির স্বার্থের বিরোধী কর আদায় এবং জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার চব্বিশ পরগণায় তিতুমীরকে উদ্বুদ্ধ করল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে। তাঁর আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হলো পুঁড়া গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। যিনি অন্যান্য জমিদারদের সাহায্যে তিতুমীর ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারণ এ সময়ে তিতুমীর যদিও ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন তাহলেও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে থাকত হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার উদাত্ত আহ্বান। এ সময়ে জমিদারদের হাতে নির্যাতিত অনেক হিন্দু চাষিও তাঁর অনুগামী হন। আবদুল গফুর সিদ্দিকী তাঁর *'শহীদ তিতুমীর'* গ্রন্থে তিতুমীরের একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিতু বলেছেন—

> ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। যাহারা মুসলমান নহে, তাহাদের সহিত কেবল ধর্মের ব্যবধানের জন্য অহেতুক বিবাদ করা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল পছন্দ করেন না, বরং আল্লাহর প্রিয় রসুল এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন— কোনো প্রবল শক্তিসম্পন্ন অমুসলমান যদি কোনো দুর্বল অমুসলমানকে তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রতি অন্যায় জুলুম ও অবিচার করে মুসলমানেরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করিতে বাধ্য।

এই বক্তৃতা তিতু সরফরাজপুর গ্রামের মুসলমান ও হরিজনদের বিবাদ মেটাতে গিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের প্রতি প্ররোচনামূলক ব্যবস্থা তিতুকে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করল। কৃষ্ণদেব রায় এক আদেশের দ্বারা জানালেন, যারা তিতুর অনুগামী অর্থাৎ ওয়াহাবী মতাবলম্বী তাদের প্রত্যেকের দাড়ির ওপর আড়াই টাকা করে খাজনা দিতে হবে। শুধু কৃষ্ণদেব রায় নয়, অন্যান্য হিন্দু জমিদারগণও মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে এই দাড়ির উপর কর আদায় করতে লাগলেন। ফলে অনিবার্যরূপে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণদেব রায়ের সমর্থনে তিতুর বিরুদ্ধে কলকাতায় লাটবাবুর বাসভবনে চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন জমিদারেরা সমবেত হন। তাঁদের সাহায্যে ইউরোপীয় নীলকর ও খ্রিষ্টান পাদ্রিরাও এগিয়ে এলেন।

তিতুমীর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নারিকেলবাড়িয়াতে একটি বাঁশের কেল্লা তৈরি করে কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেন। ঐ অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানদের তাঁর আন্দোলনে যোগ দিতে নির্দেশ দেন এবং যারা যোগদানে অনিচ্ছুক ছিল তাদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন। হানাফিপন্থি মুসলমানরা

তিতুমীর বিরোধী হওয়ায় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। জমিদারদের সাথে লড়াইতে স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসন জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করায় তিতুমীর ক্রমশ ইংরেজ বিরোধী হয়ে পড়লেন। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৬ নভেম্বর তিতুমীর সাফল্যের সাথে পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করেন ও সেখানে নীলকুঠির সহকারীকে আহত করেন। এখান থেকে তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে এবং মুসলমানরা পুনরায় হৃত রাজত্ব লাভ করেছে। ইংরেজদের সাথে কোনোরকম সহযোগিতা না করার আহ্বান জানালেন। তিতুমীরের আক্রমণাত্মক অভিযান থেকে নীলকররাও রেহাই পেল না। তিনি ইউরোপীয় নীলকরদের উপর অর্থকরও বসালেন।

তিতুর ধর্মীয় আন্দোলন যে ক্রমশ অর্থনৈতিক ও স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে একথা বুঝতে ইংরেজদের বেশি দেরি হলো না। কারণ ইতিমধ্যে যশোর, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার বহু দরিদ্র চাষি ও বেকার তাঁতি তাঁর দলে যোগ দিয়েছে।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে তিতুমীর নদীয়া জেলার লাঘটা গ্রাম এবং তারপর শেরপুর গ্রাম আক্রমণ করেন। এসব স্থানের শুধু হিন্দু প্রতিরোধকারীরাই আক্রান্ত হলো তাই নয়, এক মুসলমান ফকিরও জমিদারকে সাহায্য করার অপরাধে তাঁর হাতে নিগৃহীত হন।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ সালের অক্টোবরের মধ্যে কলকাতার উত্তর-পূর্বদিক, ফরিদপুর, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার এক বিরাট অঞ্চল বিদ্রোহীদের আস্তানায় পরিণত হলো। কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। জমিদারের বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতে গিয়ে সাফল্যের প্রতীক হিসাবে অযথা গো-হত্যা এবং কোথাও কোথাও বলপূর্বক ধর্মান্তরিতও করা হলো। তবে এক্ষেত্রে শুধু হিন্দু নয় ওয়াহাবী মতবাদ বিরোধী গোঁড়া মুসলমানরাও তাঁর হাত থেকে রেহাই পাননি। তিতুমীরের মৃত্যুর পর তারা তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিল এই কারণে।

১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরের গোড়ায় একদল শক্তিশালী ইংরেজ সৈন্য তিতুমীরের প্রধান ঘাঁটি নারিকেলবাড়িয়া অভিমুখে অগ্রসর হলো। ১৯ নভেম্বর ইংরেজদের সাথে যে লড়াই হলো তাতে তিতুমীর ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী লড়াইয়ের মধ্যেই শহীদ হলেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুম অন্যূন

তিনশো পঞ্চাশ জন অনুচরসহ শত্রু হস্তে বন্দি হলেন। বিচারে গোলাম মাসুমের ফাঁসি হলো এবং প্রায় একশো চল্লিশজনের বিভিন্ন ধরনের সাজার আদেশ হলো। বিচারের সময়ে তিতুমীরের ধর্ম সংস্কার বিরোধী কয়েকজন মুসলমান তিতুর অনুগামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

সৈয়দ আহমদ শাহের মৃত্যুর সাথে সাথে ওয়াহাবী আন্দোলনের অবসান ঘটলো না। যদিও তাঁর মৃত্যু আন্দোলনের উপর গুরুতর আঘাত হেনেছিল সন্দেহ নাই। তাঁর পাটনা সংগঠনের সহকারীদ্বয় বিলায়েত ও এনায়েত আলি আন্দোলনকে শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন। কিন্তু পাঞ্জাব ইংরেজ অধিকৃত হওয়ার পরই আন্দোলনের রূপ নিল ইংরেজ বিরোধিতায়। এর থেকে বোঝা যায় ওয়াহাবীরা শিখ ধর্মের বিরুদ্ধে নয় পাঞ্জাবের শিখ আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল।

ইতিমধ্যে ইংরেজরা বিলায়েত ও এনায়েতকে বন্দি করে পাটনায় প্রেরণ করল। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন চার বছরের জন্য শহরের বাহিরে যাবেন না। কিন্তু অচিরেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলো। সিন্ধু নদীর কাছাকাছি ওয়াহাবীদের প্রধান ঘাঁটি সিতানার সঙ্গে বিলায়েত গোপনে সংযোগসূত্র তৈরি করলেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিলায়েত সিতানা অভিমুখে অগ্রসর হন। যাওয়ার পথে বিভিন্ন শহরে গোপনে ইংরেজ বিরোধী জেহাদের কথা প্রচার করেন। দিল্লিতেও তিনি মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করান। এনায়েত এর কিছুদিন পূর্বে সিতানায় হাজির হয়েছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে বিলায়েত সম্পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে এ ধরনের লড়াইতে নামতে রাজি ছিলেন না। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে বিলায়েতের মৃত্যুর পর পুরো নেতৃত্ব এনায়েতের উপর অর্পিত হলো এবং তিনি তাঁর পরিকল্পনা কাজে রূপায়িত করতে এবার সচেষ্ট হলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ওয়াহাবী খলিফাদের আহ্বান করা হলো জেহাদ ঘোষণা করে সিতানা অভিমুখে অগ্রসর হতে। বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে না তাদের বলা হলো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। কাফের শাসকের সাথে সর্ববিধ সংশ্রব বর্জন করা হলো।

আন্দোলন ক্রমশ মিরাট, বেরিলি, দিল্লি এবং বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। পাটনা শহরে আহমদুল্লাহ একা প্রায় সাতশোর বেশি সশস্ত্র

অনুচর সংগ্রহ করলেন। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও ওয়াহাবীরা সক্রিয় হলো। গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ওয়াহাবীদের উপর তীব্র নজর রাখার জন্য গোপন নির্দেশ জারি করলেন।

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজের সাথে এক সংঘর্ষে ওয়াহাবীরা দরুণভাবে পরাজিত হলো। তাদের অন্যতম নেতা করম আলি নিহত হলেন এবং এনায়েত কোনো রকমে প্রাণ বাঁচালেন। এই পরাজয়ের পর এনায়েত আরও সাবধানতার নীতি গ্রহণ করেন। অনুগামীদের নিয়মিত সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত গাওয়া হলো।

কয়েকটি সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার পর এনায়েত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের সহায়তায় শেখ জানা নামক স্থানে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অতর্কিতে ইংরেজ অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার লেফটেন্যান্ট হর্নির শিবির সাফল্যের সাথে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ হতে তিনি বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন।

ইতিমধ্যে নতুন করে আক্রমণ ব্যূহ রচনা করার পূর্বে দেশে সিপাহি বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম জাতীয় মহাসমর শুরু হয়ে গেল। এনায়েত চিঙ্খাই থেকে সোয়াট অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার কালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এনায়েতের অসম্পূর্ণ কাজের ভার পড়লো বিহারের মকসুদ আলির ওপর।

উল্লেখ্য, সিপাহি বিদ্রোহে ওয়াহাবীদের ভূমিকা সামনের সারির সৈনিকের না হলেও নিষ্ক্রিয়তার ছিল না। ওয়াহাবীদের সাথে সিপাহিদের পরোক্ষ যোগাযোগ যে ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর লিখিত *'ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি অ্যাণ্ড ইন্ডিয়ান রেনেশাঁস'* (নবম খণ্ড, ভারতীয় বিদ্যাভবন) গ্রন্থে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে বহু অপরিজ্ঞাত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে সিপাহি বিদ্রোহে ওয়াহাবীদের ভূমিকা মুখ্য নয়। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন কীভাবে সিপাহিরা ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্ররোচিত হয়েছিল। জেলা পুলিশ শাসক রেলির রিপোর্ট অনুযায়ী চর্বি-দুষ্ট টোটার গুজব ওয়াহাবীরাই ব্যারাকপুরে পুলিশ মহলে ছড়িয়েছিল। এই গুজবের উৎপত্তি ঘটে প্রথম কলকাতার মিশ্রিগঞ্জ মসজিদে। ঐতিহাসিক কে. এম. আশরাফের মতে হায়দরাবাদ, পাটনা এবং আগ্রার বিদ্রোহের পেছনে ওয়াহাবীদের গোপন

হাত নিপুণভাবে কাজ করেছিল। পাটনার ওয়াহাবী অভ্যুত্থান এ সময়ে সামরিক শক্তির সাহায্যে দমন করা হয়। হায়দরাবাদের ওয়াহাবী নেতা আলাউদ্দিনকে আন্দামানে চালান দেওয়া হলো। আগ্রা দুর্গের অবরোধকারীদের নেতা উজির খাঁ ছিলেন ওয়াহাবী। সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচারের সময়ে দিল্লির বিদ্রোহীদের সমর অধিনায়ক বখত খাঁ-কে একজন ওয়াহাবী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। বিচারে আরও প্রকাশ পায় জয়পুর, ভূপাল হানসী এবং হিসার অঞ্চল থেকে দলে দলে ওয়াহাবীরা রাজধানী দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল। জনৈক আধুনিক লেখক ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তারা সিপাহি বিদ্রোহের তাৎপর্য্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের সঠিক তাৎপর্য বিদ্রোহের সমস্ত নেতারাই কি একইভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, না একমত হয়েছিলেন? গোটা বিদ্রোহে কখনই ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি— যদিও সিপাহিরা ও তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসা জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। ওয়াহাবীরা সিপাহিদের মতোই তাদের সীমাবদ্ধ উপলব্ধি— যা তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লাভ করেছিল—তাই নিয়েই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।

ক্রমশ সিতানার ঘাঁটি ব্রিটিশদের কাছে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে ষোলোটি অভিযান বিদ্রোহীদের উৎখাত করার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু কোনো অভিযানই বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি—অবশেষে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে স্যার সিডনী বাটন প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে মকসুদ আলির মৃত্যুর পর বিলায়েতের পুত্র আবদুল্লাহ নেতা নির্বাচিত হলেন। অশান্তির আগুন দীর্ঘায়ত হলো। সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিরা ওয়াহাবীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে সিতানা পুনরায় বিদ্রোহীরা দখল করে নিল। পাঞ্জাব সরকার তাদের রিপোর্ট-এ ওয়াহাবীদের 'নিরাপত্তার পক্ষে স্থায়ী বিঘ্ন' বলে মত প্রকাশ করেন।

বিদ্রোহ সমূলে উৎখাত করার জন্য ইংরেজ সরকার এবার রীতিমত তৎপর হলো। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে স্যার নেভিল চেম্বারলেন চুমলা উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা উপত্যকার আম্বেলা গিরিপথে বিদ্রোহীদের কাছে বাধা পেল। বিদ্রোহীদের হঠাবার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা কেবল বৃদ্ধি পেল। এমনকি এক সময়ে ওয়াহাবীরা শত্রুপক্ষের কাছ থেকে একটি ঘাঁটিও কেড়ে

নিয়েছিল। ইংরেজ বাহিনীর দুরবস্থা ক্রমশ চরমে উঠল। চেম্বারলেন অতিরিক্ত সাহায্যের আশায় জরুরি তারবার্তা পাঠালেন। এই সংকট অবস্থায় জেনারেল গারভক বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় নয় হাজার সৈন্য নিয়ে শক্তিপ্রয়োগ করে আরও অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। লাল্লুর নামক স্থানে এবং বনায়ের পর্বত গাত্রে বিদ্রোহীরা পরাজিত হলো।

কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে সিতানা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের বিদ্রোহী আশ্রয়স্থল মালকা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজরা ধ্বংস করল।

ওয়াহাবীদের ঘাঁটি ধ্বংস করার সাথে সাথেই ইংরেজরা এই আন্দোলনের মূলে আঘাত করতে সচেষ্ট হলো। আরম্ভ হলো বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী, সমর্থনকারীদের উপর নানাবিধ নির্যাতন। বিদ্রোহীদের গোপন কাগজপত্র থেকে খোঁজ পাওয়া গেল এইসব সাহায্যকারীরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। খুঁজে খুঁজে বের করা হলো এই সমর্থনকারীদের। অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও রেহাই পেল না। রাষ্ট্রদ্রোহীতার নামে কাউকে ফাঁসি আর কাউকে দীর্ঘ কারাবাসে দণ্ডিত করা হলো। শুরু হলো বিচারের নামে প্রহসন। ১৮৬৪-র আম্বালা বিচার, ১৮৬৫-র পাটনা বিচার, ১৮৭০-র মালদা ও রাজমহলের বিচার এবং ১৮৭০-৭১-র ওয়াহাবী বিচার উল্লেখযোগ্য।

প্রতিহিংসামূলক বিচার ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ক্রমশ ওয়াহাবী আন্দোলন তার শক্তি হারিয়ে এক সময়ে ভারতে লুপ্ত হয়ে গেল। সামগ্রিকতা, সংহতি, নিয়মিত পুঁজি ও রসদের অভাবে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল।

ওয়াহাবী আন্দোলন গোড়ার দিকে ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিশেষ এক শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সৈয়দ আহমদ শাহের দূরদর্শী নীতির ফলে এই মতবাদ কেবলমাত্র তত্ত্বের নীরস কচকচির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের সাথে সাথে ওয়াহাবী আন্দোলন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক রূপ নিল। ফরায়েজিদের আন্দোলন প্রধানত জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ায় নিম্নশ্রেণির মুসলমানরা যে পরিমাণ আন্দোলনের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন সে রকমটি শহরের অর্থবান মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ঢাকা ডিভিসনের রেভিনিউ কমিশনার আই ডানবারের বক্তব্য অনুযায়ী ফরায়েজিপন্থি কৃষকরা জমিদার ও তালুকদারের নানারকম

অন্যায় কর আদায় করতে বাধা দেয়। এক কথায় তাদের কাছ থেকে কর আদায় করাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ডানবার তাঁর রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে লেখেন যে, ফরায়েজিদের শুধু হিন্দু বা ইউরোপীয়নরাই নয়, রক্ষণশীল মুসলমানরাও অপছন্দ করে।

তিতুমীরের আন্দোলন হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র আকার ধারণ করার সাথে সাথে অনেক নির্যাতিত হিন্দুও তার দলে যোগ দেয়। আবদুল গফুর সিদ্দিকী তাঁর বই *'শহীদ তিতুমীর'*-এ লিখেছেন যে, তিতুর অনেক বক্তৃতার প্রধান বিষয়ই ছিল হিন্দু কৃষকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবী আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমান সুবিধাভোগী শ্রেণির কেউই সুনজরে দেখেনি। ওয়াহাবী আন্দোলন এদের বিরুদ্ধে সমভাবে পরিচালিত হয়েছিল। ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার *'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান'* বইতে লেখেন যে, ওয়াহাবীদের কোনো একটি বিশেষ জেলায় উপস্থিতি সেখানের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সুবিধাভোগী শ্রেণির ক্ষেত্রে বিপদের কারণ ছিল। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহে ওয়াহাবীরা হিন্দু মুসলমান কোনো জমিদারকে রেহাই দেয়নি। ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান জমিদারকূলের সাথে প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা পুরোহিতেরা হাত মিলিয়ে ছিল বলে হাণ্টার অভিমত প্রকাশ করেছেন। হাণ্টারের মতে ওয়াহাবীরা ধর্মের দিক থেকে ছিল ইউরোপের চরমপন্থি 'অ্যানাব্যাপটিষ্ট' ও 'ফিফথ মনারকি'দের মতো। আর রাজনীতির দিক থেকে ছিল 'রেড রিপাবলিকান' বা 'কম্যুনিষ্ট'দের অনুরূপ। কিন্তু হাণ্টার যে কথা বলেননি তা হচ্ছে— ওয়াহাবী বিরোধী দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল ইংরেজ সরকার। কারণ সর্বশেষ বিশ্লেষণে ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন সরাসরি ইংরেজ বিরোধিতার সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। এনায়েত, তিতুমীর ও দুদু মিঞার লড়াই শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

সি. ডব্লিউ স্মিথ তাঁর বই *'মর্ডাণ ইসলাম ইন ইন্ডিয়া'*-তে লিখেছেন যে, ধর্মীয় আন্দোলন সত্ত্বেও উচ্চশ্রেণির অর্থাৎ ধনী মুসলমানরা বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক মুসলমান জমির মালিকরা মোল্লাদের সাথে হাত মিলিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে কোনোরকম সংস্কারের তীব্র বাধা দেবেন। তাঁদের কাছে সব সময়ে অপরিবর্তনশীলতাই কাম্য। যেমনটি লক্ষ্য করা যায় সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে পিউরিটান ধর্মীয়দের বিরুদ্ধে অভিজাত গোষ্ঠীর চার্চের সপক্ষে

আক্রমণ পরিচালনা। লোয়ার প্রভিন্সেস-এর সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ডব্লিউ ডেমপিয়ার ওয়াহাবী পন্থিদের সম্পর্কে এক নাটকীয় বর্ণনা দিয়েছেন। ওয়াহাবীরা তাঁর ভাষায় 'আশি হাজারের জমায়েত, যারা এসেছিল নিম্নশ্রেণি থেকে এবং নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল।' এমন একটি সম্প্রদায় যে জমির মালিকদের ক্ষেত্রে ভীতির সঞ্চার করবে খুবই স্বাভাবিক। ফরায়েজিদের বক্তব্য ছিল আল্লাহর নিকট সবাই সমান। জমির মালিক আল্লাহ এবং কারুর নিজের স্বার্থে কৃষকদের নিকট খাজনা দাবি করা উচিত নয়। তিনি বলতেন টাকা ঋণ দিয়ে সুদ নিতে নাই। প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবীরা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হিসেবে বুঝেছিলেন, যদি তাঁদের ধর্মীয় সংস্কারগুলির পেছনে জন সমর্থন করতে হয় তাহলে অতি অবশ্য গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের গ্রাম্য অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকের সপক্ষে বক্তব্য রাখতেই হবে। আর এই প্রচারকে নিছক মোল্লা জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না—কারণ, যে ইংরেজ শক্তি সরকার হিসেবে এদের মদত যোগাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও শেষ পর্যন্ত ওয়াহাবীদের বক্তব্য রাখতে হলো।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *ব্রিটিশ 'প্যারামাউন্টসি অ্যাণ্ড ইন্ডিয়ান রেনাশাঁস'* বইতে ওয়াহাবী আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি নিছক মুসলমানদের একটি আন্দোলন। দু-একজন বাদে শ্রেণিগতভাবে হিন্দুরা এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন ছিল। ওয়াহাবীরা দেশকে মুক্ত করার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তবে ব্রিটিশদের পরিবর্তে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল উদ্দেশ্য। আন্দোলন গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত ছিল না। হাণ্টারও এই আন্দোলনকে হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক বলে বর্ণনা করেছেন।

ধর্মের মতো একটি সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে আশ্রয় করে যে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না, এ অভিমত নিঃসন্দেহে সত্য। শিল্প বিকাশের অনুন্নতস্তরে বুর্জোয়া জাতীয়তার বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষে তখন গড়ে ওঠেনি। তাই সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেও ধর্মকে কেন্দ্র করে ওয়াহাবীরা যে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তার গুরুত্বকে কোনোভাবেই লঘু করা যায় না। বিশেষ করে আন্দোলনের ক্রমবিকাশে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছেও এটি বেশি দিন কেবল ধর্ম সংস্কারের মধ্যে সীমিত ছিল না। হান্টারের মতে দুদু মিঞা ও তিতুমীরের আন্দোলন ছিল শ্রেণিসংগ্রাম। ব্রিটিশ

শাসনের অবসান ঘটেছে বলে ফরায়েজিরা তাদের বক্তব্য প্রচার করতে আরম্ভ করছিল। *'দি ওয়াহাবী ম্যুভমেন্ট'*-এর লেখক কেয়ামুদ্দিন আহমদ ওয়াহাবী আন্দোলনকে ইংরেজ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনরূপে অভিহিত করেছেন। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার শ্যালক হিন্দু রাও ছিলেন সৈয়দ আহমদের সমর্থক। বোম্বাইয়ে ওয়াহাবী দলের সভায় হাজার হাজার হিন্দুরা যোগ দেয়। ভারতের অভ্যন্তর থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ওয়াহাবী কেন্দ্রে অর্থ সরবরাহ হিন্দু বণিক ও মহাজনরাই করেছিল। সৈয়দ আহমদের চিঠিপত্রে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ওয়াহাবী আন্দোলনের মূলকথা ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ। সেখানে অন্য ধর্মের বা সম্প্রদায়ের বিরোধিতা অবান্তর। শিখদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সাধারণ হিন্দু প্রজা বা শিখ অত্যাচারিত হয়ে থাকলে সেটিকে মূল লক্ষ্য না বলে লড়াইয়ের বাড়াবাড়ি বলাই উচিত হবে। যেমনটি ঘটেছিল একশতক পূর্বে বান্দার নেতৃত্বে শিখ কৃষকদের বিদ্রোহের (১৭০৮-৮৬) সময়ে। প্রতিপক্ষ মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল মুসলমান ভূম্যধিকারীরা। তাই বান্দার আক্রোশের লক্ষ্য হয়েছিল তাঁরা। সরহিন্দের মুঘল শাসনকর্তা ওয়াজির খান এবং মুসলমান ভূম্যধিকারীরা বান্দার আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে একজোট হলেন। তবু শেষ রক্ষা সম্ভব হলো না। ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মে বান্দা শহরটি দখল করলেন এবং লুণ্ঠন ও হত্যালীলা চালালেন। অসংখ্য মসজিদ অপবিত্র হলো, বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত হলো এবং স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সাধারণ মুসলমানরাও হত্যার হাত থেকে রেহাই পেল না। অবশ্য বান্দা এক্ষেত্রে ওয়াজির খাঁয়ের বশম্বদ এবং প্রিয়পাত্র হিন্দু ব্রাহ্মণ সূচানন্দকেও রেহাই দেননি—যেমনটি দেননি আরেক কৃষক বিদ্রোহের নেতা তিতুমীর। এর প্রায় একশো বছর পরে তাঁরই সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষ হানাফি মতাবলম্বীদের। অথচ বান্দার বিদ্রোহেও সাধারণ মুসলমানরা যোগ দিয়েছিল (রুকাৎ-ই আমিন-উদ্-দ্দৌলার ৩নং চিঠি) এবং তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ছত্রশাল বুন্দেল ও অন্যান্য হিন্দু ভূম্যধিকারীরা।

যে সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঠিক নেতৃত্ব ও তার প্রয়োগ উভয়ই অপরিজ্ঞাত, সে সময়ে স্বাভাবিকভাবেই অত্যাচারিতের দৃষ্টিতে শোষক শ্রেণি, তার ধর্ম এবং সেই ধর্মের অনুসারী যে সাধারণ মানুষ সব কিছুরই সমর্থক বলে বিভ্রম হয়, তাই কারুর রেহাই ঘটে না।

ঐতিহাসিক মজুমদার স্বয়ং স্বীকার করেছেন হিন্দুদের অনেকে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিছু হিন্দুকে ওয়াহাবী সমর্থক সন্দেহে আটক করা হয়। ওয়াহাবী আন্দোলনের কৃতিত্ব বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, ওয়াহাবীরা কখনও হিন্দুদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। তিতুমীরের মৃত্যুর পর গ্রেফতারকৃত সঙ্গীদের বিচারের সময়ে কয়েকজন মুসলমান তাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজ আদালতে সাক্ষী দিয়েছিল। সি. ডব্লিউ. স্মিথ ওয়াহাবী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে অর্থনৈতিক দিক থেকে ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণ মাত্রায় 'শ্রেণি সংগ্রাম'। এর থেকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছিল। শিল্প বিকাশের পূর্বযুগে শ্রেণি সংগ্রাম যেভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধ্বনি গ্রহণ করেছিল সেইভাবে এই শ্রেণি সংগ্রামেও ধর্মীয় ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেই ধ্বনি ধর্মীয় হলেও সাম্প্রদায়িক ছিল না।

সুতরাং ওয়াহাবী বিদ্রোহ নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণির মুসলমানদিগকে ক্ষিপ্ত করে প্রকাশ্যে লড়াইতে টেনে আনেনি। স্মিথের মতে, ওয়াহাবীরা মুসলমান শ্রেণি শত্রুদিগকে সাম্প্রদায়িক 'বন্ধু' রূপে গণ্য করে তাদের সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠার নামে নিম্নশ্রেণির মুসলমানদিগকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেনি।

ওয়াহাবী আন্দোলন সফল হলেও ওয়াহাবীরা নিছক সাম্প্রদায়িক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করত বা করতে সমর্থ হতো কি না তা নিশ্চয়ভাবে বলা যায় আন্দোলনের সামগ্রিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। কারণ, আন্দোলন শুরুতে সম্প্রদায় ভিত্তিক হলেও পরিশেষে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আন্দোলন যখন জোর কদমে এগিয়ে চলেছে তখন হিন্দু-মুসলমানের সম্ভাব্য ঐক্যে আতঙ্কিত বোধ করে ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করলেন সাম্প্রদায়িক নীতি বা ডিভাইড অ্যান্ড রুল গ্রহণ করতে। কেয়ামুদ্দিন আহমদের মতে ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতে একচ্ছত্র মুসলিম আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্য নিয়েছিল একথা মনে করার কারণ নেই। তিনি সৈয়দ আহমদ শাহের একটি চিঠির উল্লেখ করে বলেন যে, সৈয়দ আহমদের ইচ্ছা ছিল যে, ইংরেজ ভারত ছাড়লে হিন্দু ও মুসলিম বিভিন্ন রাজাদের রাজ্য শর্তসাপেক্ষে ফিরিয়ে দেয়া হবে। অনেকের মতে ওয়াহাবী আন্দোলন 'সিপাহি বিদ্রোহের' জমিটিকে উর্বর করেছিল। যদি এই মতামতের মধ্যে কিছুটা সত্যতা লুকিয়ে থাকে তাহলে

বলা যায় সিপাহি বিদ্রোহের সাফল্য অর্জন করলে নিশ্চয়ই তা শুধু মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করত না, সেটি অবশ্যই হিন্দু-মুসলানদের যুগ্ম বিজয়রূপেই স্বীকৃতিলাভ করত। ওয়াহাবীদের ইংরেজ-বিরোধিতা ১৮৬৩-র সিতানায় চরম বিপর্যয়ের পরও দীর্ঘকাল কী পরিমাণ সক্রিয় ছিল তার একটা বিবরণ তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকা (২৫ এপ্রিল, ১৮৭২)-র মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়—

> ...ওয়াহাবী দল অদৃশ্য। কোথায় তাহারা আছে ও কোথায় যে নাই তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। যদি ডাক্তার হান্টার সাহেবের কথা সত্য হয় তবে ওয়াহাবীরা ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছে। (ডাক্তার উইলিয়াম হাণ্টার প্রণীত Indian Musalmans পুস্তকে প্রদত্ত 'ওয়াহাবী আন্দোলনের ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য।) এ দেশের জনসংখ্যার আটভাগের এক ভাগ মুসলমান, সুতরাং তাহাদের নির্মূল করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। ...হান্টার সাহেব যাহা লিখিয়াছেন যদি সত্য হয় তবে তাহারা নিঃশব্দে ক্রমে ক্রমে যেরূপ দেশে বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা অননুভাবনীয়। গভর্নমেণ্ট ইহা অবগত হইয়া যে ইহাদিগকে শাসন করিবারও উদ্যোগ করিলেন আর দেশের দুইটি প্রধান ব্যক্তি (বড়লাট লর্ড মেয়ো, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্মান) প্রাণ হারাইলেন। পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যখন যেখানে হইয়াছে, একসূত্রে না একসূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ওয়াহাবী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি অথচ উহা ধরিবার যো নাই।

অমৃতবাজারের মতে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা এদের দমন করা যাবে না, পত্রিকা লিখেছে—

> এই ষড়যন্ত্রের একটি বিষয় দেখিয়া আমরা অবাক হই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সবাই সাহসী ধর্মোন্মত্ত, অকাতরে প্রাণ দিবে অথচ কিছু প্রকাশ করিবেন না, এরূপ লোক কোটির মধ্যে একজন পাওয়া কঠিন। এরূপ লোক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কেবল অসাধ্য নহে কিন্তু অনুসন্ধানে প্রবৃত হইলে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। আমাদের রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা বিস্তর সত্ত্বেও ইহার নিগূঢ় কারণ তাহারা বাহির করিতে পারিলেন না। যে ষড়যন্ত্র এরূপ লোকদ্বারা সৃষ্ট যাহা কল্পনা চক্ষেও অদৃশ্য, যাহার প্রকৃতি এরূপ অভেদ্য এবং যাহা সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শাসন দ্বারা দমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

লক্ষ্যণীয় অমৃত বাজার পত্রিকা 'মুসলমানদের প্রতি লোমকূপে' না লিখে 'ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে' ওয়াহাবীদের প্রভাব বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছে।

যাইহোক তা সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে ওয়াহাবীরা যে আন্দোলন করেছিল, তা সম্প্রদায় নির্বিশেষে কখনই সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে না। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এই আন্দোলন দমন করা শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। একথা ঠিক যে, পরবর্তীকালে এটি একটি অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিচ্ছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তা প্রাথমিক স্তরে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু কৃষকের পক্ষে তার ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা কাটিয়ে উঠে হিন্দু জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইতে মুসলমান কৃষকের সাথে একাত্মতা বোধ করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। আর ওয়াহাবীদের তরফে সে ধরনের কোনো সযত্ন প্রয়াসও ছিল না। বাংলাদেশে হিন্দু কৃষকরা ফরায়েজী ও তিতুমীরের হাতে এবং পাঞ্জাবে শিখ কৃষকরা ওয়াহাবীদের হাতে অনেক বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছিল।

ওয়াহাবীদের ধর্মীয় সংস্কারের বক্তব্য রক্ষণশীল নেতাদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ মনে হয়েছিল। তারা স্বাভাবিকভাবে একে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ ও স্বয়ং নির্বাচিত অভিভাবকত্বের আবির্ভাব হিসেবে দেখেছিলেন। সনাতন ধর্ম ও সাম্রাজ্যবাদী সহাবস্থানের ক্ষেত্রে ওয়াহাবীদের বক্তব্য যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল। ভুল হোক, ঠিক হোক, তা ছিল প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির পরিপন্থি। ফলে দেখা গেল ফতোয়া জারি হলো মহারানী ভিক্টোরিয়ার সমর্থনে শিয়া এমনকি কলকাতার সুন্নীরা ভারতবর্ষ "দার-উল-হারব" হয়ে গেছে—এই বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। আবার উত্তর ভারতের মুসলিম শাস্ত্রজ্ঞরা যদিও ভারতবর্ষকে "দার-উল-হারব" বলে স্বীকার করলেন কিন্তু সেই সাথে বললেন এর মানে এই নয় যে মুসলমানদের জেহাদ ঘোষণা করতে হবে।

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর ওয়াহাবীদের মধ্যে ঐক্যের প্রশ্নটিও আন্দোলনকে দুর্বল করার পক্ষে সহায়ক হয়। প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয় এই আন্দোলন। ১. তাঐউনি (অভিন্নপথ) ২. পাটনাস্কুল ৩. আহল-ই-হাদিস (পয়গম্বরের ট্রাডিশন)। বাংলাদেশে অতিরিক্ত আরও একটি সংযোজিত হলো, যথা—ফরায়েজি মতবাদ। যদিও এদের মূলকথা আড়ম্বর বর্জিত ইসলামের

বিশুদ্ধতা রক্ষা, তথাপি দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ফরায়েজিদের মতে দেশ যতদিন বিদেশি শাসনের অধীনে থাকবে ততদিন জুম্মার ও ঈদের নামাজ আদায় বন্ধ থাকবে। কিন্তু তাঐউনি মতের নেতা কেরামত আলি উপরোক্ত কারণেই ফরায়েজিদের তীব্র সমালোচনা করেন। পাটনা পন্থিরা চারটি স্বীকৃত সুন্নী আইন ধারার কোনো একটির সাথে নিজেদের যুক্ত করার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ততা দেখানোর জন্য কেরামত আলি তাদেরও নিন্দা করেন। আবার 'আহল-ই-হাদিস'-পন্থিরা জুম্মা ও ঈদের নামাজ পড়ায় অনেক সময়ে ফরায়েজিদের বিরাগভাজন হলো। ফরায়েজিরা ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হারব' বলে মনে করতেন, কিন্তু 'তাঐউনি' আন্দোলনের নেতা কেরামত আলি সুস্পষ্টভাবে বলেন ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষ 'দার-উল-হারব'-এ পরিণত হয় নাই। আবার ফরায়েজিরা ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যা করে হানাফিকে স্বীকার করলেও তিতুমীর তার বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন হানাবালির সমর্থক। তিতুমীরের আন্দোলনকে দমন করার জন্য জমিদাররা হানাফিদের উপযাচক হয়েছিলেন।

ওয়াহাবী আন্দোলন ও সিপাহি বিদ্রোহের পর মুসলমানরা বিদেশি শাসকদের নিকট বিদ্রোহী হিসেবে দীর্ঘকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে গেল। মুসলমানদের উপর নানাবিধ অত্যাচার শুরু হলো। সরকারি সুযোগ-সুবিধা আলিগড় আন্দোলন পর্যন্ত হিন্দুদের খাতে প্রবাহিত হলো। লর্ড এলেনবরার মতে মুসলমানরা মূলত ইংরেজ বিরোধী। ইংরেজদের সপক্ষে হিন্দুদের অনুকূল মনোভাব জাগিয়ে তোলাই হবে ভারতে ইংরেজ নীতি।

মুসলমানদের তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব তাঁদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ধর্মের কারণে ইংরেজি শিক্ষা অন্যায় বলে ঘোষিত হলো। আরবি, ফারসি এবং ইসলামীয় গণিত এবং বিজ্ঞানের চর্চা জোর কদমে শুরু হলো। মেয়েরা বেশি পর্দানশীল হয়ে পড়ল। ধর্মের মূলনীতির উপর জোর দেওয়া হলো। ইংরেজি শিক্ষার অভাবে সরকারি চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মুসলমানরা ক্রমশ হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে পড়ল।

সি. ডব্লিউ. স্মিথের মতে ওয়াহাবীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সত্ত্বেও তাদের ধর্মীয় ধ্বনির জন্যই ওয়াহাবী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উৎসাহিত করেছে এবং বিপুল সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এমন একটা ধারণা

জাগিয়ে তুলেছে যা পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক প্রচারে সহজেই সাড়া দিয়েছে। স্মিথ মনে করেন ধর্মের বিষয়টি না থাকলে তা হয়তো এত সহজে সম্ভব হতো না। রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখায় এই মতামতের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসের ধ্যান ধারণায় যাঁরা মজুমদার থেকে অন্য মেরুতে অবস্থান করেন সেই *'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'*-এর লেখক সুপ্রকাশ রায় এবং *'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ'*-এর লেখক অমলেন্দু দে-ও স্মিথের উপরোক্ত মতামতের সোৎসাহী সমর্থক।

কার্ল মার্কস 'ধর্ম' সম্বন্ধে বলেছেন, "Religion is the sigh of the oppressed creature the sentiment of a heartless world, the soul of soulless conditions". সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্ষম শ্রেণিগুলির আবির্ভাব তখনও পর্যন্ত না ঘটায় গণবিদ্রোহগুলি তৎকালীন ঐতিহাসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় অথবা সংকীর্ণতার চরিত্র নিয়েছিল। যেগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় কৃষকদের জন্য সামাজিক ও সম্পত্তির সমতা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং প্রাচীন মূল্যবোধকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা। ইরানের বাবদের (Babist) বিদ্রোহ (১৮৪৮-৫২), চীনে তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫০-৫৬) এবং ভারতে ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩০-৭০)-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু হলো এবং যার দ্বারা প্রতারিত হলেন বা যার দিকে স্বেচ্ছায় চোখ বন্ধ করে থাকলেন উভয় সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া নেতারা, তার সাথে ওয়াহাবী আন্দোলনের জের খুঁজতে যাওয়া সত্যের অপলাপ—এ যেন জোর করে একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা বা মূল শত্রুকে আড়াল করার জন্য একটা অজুহাত বার করা—যা স্মিথ সাহেবের ক্ষেত্রে বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় লেখকদের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে অগভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। জার্মানিতে ষোড়শ শতকে যে কৃষক বিদ্রোহ (১৫২৪-২৫) হয়েছিল তাতে জোর দেওয়া হয়েছিল ধর্ম সংস্কারের উপর। লুথারীয় চার্চের বক্তব্য ছিল আড়ম্বর বর্জিত বাইবেলের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিষ্ট বিরোধিতার তথাকথিত অভিযোগ এনে, আসলে যা ছিল নিতান্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, হিটলার যে ইহুদি নির্যাতন শুরু করেছিলেন তার কারণ হিসেবে যদি লুথারীয় চার্চের বিশুদ্ধতার আন্দোলনকে দায়ী করা যায় তবে তা হবে নেহাতই কষ্ট-কল্পিত।

বিশ শতকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যখন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণির অংশ হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছে, তখন কোনো সম্প্রদায় বিশেষের সাম্প্রদায়িক চিন্তা ধর্মপ্রসূত ঘটে না, ঘটে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার জন্য এবং সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভাবের জন্য। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সম্পর্ক লিখতে গিয়ে সাইমন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের এই বিরোধ যত তীব্র সে তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রায় কিছু নাই বললেই চলে। অথচ দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মেলামেশা অব্যাহত ছিল। ওয়াহাবীদের ধর্মসংক্রান্ত প্রচার নিশ্চয় ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতীয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত মুসলমানদের ভেতর তাদের ধর্ম সংস্কারের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। তাহলে এই তফাত কেন? এর উত্তর রজনী পাম দত্ত সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন তাঁর *'ইন্ডিয়া টুডে'*তে—

> 'Communal Strife is thus a special product of British rule, and in particular of the latest period of British rule, or of the declining imperialist ascendancey.'

গ্রন্থপঞ্জি (ওয়াহাবী আন্দোলন)

১. ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেনেশাঁস; নবম খণ্ড; পার্ট ওয়ান।— রমেশ চন্দ্র মজুমদার (জেনারেল এডিটর) বোম্বাই, ১৯৬৩

২. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস— ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, কলকাতা, ১৯৪৫ (রিপ্রিন্টেড)

৩. দি ওয়াহাবী ম্যুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া— কেয়ামুদ্দীন আহমদ, কলিকাতা, ১৯৬৬

৪. শহীদ তিতুমীর— আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ঢাকা, ১৩৭৫

৫. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম— সুপ্রকাশ রায়, কলিকাতা, ১৯৭২ (উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ এর লেখা 'মডার্ণ ইসলাম ইন ইন্ডিয়া' পুস্তকের উদ্ধৃতি উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।)

৬. বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ— অমলেন্দু দে, কলিকাতা, ১৯৭৪

৭. হিস্ট্রি অব দি ফরাইজি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৮১৮-১৯০৬)— মইনুদ্দীন আহমদ খাঁ, করাচি, ১৯৬৫

৮. 'এক্ষণ' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বি-মাসিক পত্রিকা); শারদীয় ১৩৮৫, "মুঘল যুগে কৃষক-বিদ্রোহ"— গৌতম ভদ্র

৯. ইন্ডিয়া টুডে— রজনীপাম দত্ত, কলিকাতা, ১৯৭০

আলিগড় আন্দোলন

১৮৭৭ সালের ৮ জানুয়ারি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড লিটন আলিগড়ে 'মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' (সংক্ষেপে– এম. এ. ও. কলেজ) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[১] কলেজটি অবশ্য দু-বছর আগেই তৈরি হয়েছিল—১৮৭৫ সালের ২৪ মে। শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল ওই বছরের ১ জুন থেকে। পরবর্তীকালে এই কলেজকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজে শুধু ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি, ঘটেছিল আধুনিক ভাবধারার প্রচণ্ড সূর্যালোক, যে আলোতে সমাজের মূলব্যাধি সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির অনেক কুয়াশা ফিকে হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সমাজে এক নবজাগরণের সূচনা হলো।

কে. এ. নিজামী তাঁর *'সৈয়দ আহমদ খান'* নামক বইতে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের প্রবেশকালে গোঁড়ামি, কুসংস্কার, আলস্য এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৮১৭ সালের ১৭ অক্টোবর দিল্লিতে এক অভিজাত মুসলমান পরিবারে সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম হয়। পিতা সৈয়দ মুতাক্‌কি খান মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহের দরবারে চাকুরি করতেন। সে সময়ের অন্যান্য অভিজাত পরিবারের সন্তানের মতো সৈয়দ আহমদও আরবি, ফারসি ও ইসলামি শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

---

১. সৈয়দ আহমদ খান, কে. এ. নিজামী; পাবলিকেশনস ডিভিশন; গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪, পৃ. ৮৩, প্রবন্ধে উল্লেখিত সৈয়দ আহমদ খান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এই পুস্তক থেকে গৃহীত।

কৌতূহলের ব্যাপার, যদিও স্যার সৈয়দ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধানত স্মরণীয় হয়ে আছেন তথাপি তিনি নিজে ওই ভাষায় প্রায় অপরিচিত ছিলেন। জীবনের শেষের দিকে স্বচেষ্টায় কিছুটা ইংরেজি বলতে ও বুঝতে পারতেন।

পিতার মৃত্যুর জন্য বাইশ বছর বয়সে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকুরি নেন এবং কালক্রমে মুনসেফের পদে উন্নীত হন। মুঘল সম্রাটের পড়তি আর্থিক অবস্থার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি দরবারে চাকুরি নেননি।

বদলির চাকুরিতে তিনি যখন ফতেপুর সিক্রিতে আসেন তখন তাঁর মধ্যে দেখা যায় লেখার উদ্যম। পয়গম্বরের জীবনী সমেত এ সময়ে তিনটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি 'রিসালা' লেখেন। ১৮৫৫ সালে মুনসেফ থেকে 'সদর আমিন'-এর পদে উন্নীত হয়ে তিনি বিজনোর আসেন। এর দু-বছর চার মাস বাদে ভারতের প্রথম মহাবিদ্রোহ— 'সিপাহি বিদ্রোহ' ঘটে। সৈয়দ আহমদ নিজের জীবন তুচ্ছ করেও প্রিয় বিশজন ইউরোপিয়ানকে বিদ্রোহীদের রুদ্র রোষ থেকে বাঁচান, অথচ সে সময়ে তাঁর পরিবারবর্গ দিল্লিতে বিদ্রোহীদের হাতে অশেষ নির্যাতনের সম্মুখীন হন। এই নির্যাতনের জের হিসেবে তাঁর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই মারা যান।

সিপাহি বিদ্রোহের মর্মান্তিক ঘটনাবলি সৈয়দ আহমদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, নিজামী লিখেছেন— তাঁর মনে হলো ব্রিটিশদের প্রতিরোধের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এ লড়াই জ্ঞানের বিরুদ্ধে অজ্ঞতার, তাই সর্বনাশ ও পরাজয় নিশ্চিত। তিনি স্থির করলেন মুসলমানদের রাজনীতি বর্জন করে আধুনিক জ্ঞান চর্চার উপরই অতঃপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ইতিমধ্যে সরকারের প্রতি আনুগত্যের জন্য তিনি দু'শো টাকার এক মাসোহারা লাভ করেন। এটি তাঁর পুত্রের জীবদ্দশা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁকে অবশ্য বিদ্রোহীদের বাজেয়াপ্ত কৃত চাঁদপুর ও বিজনোরের এক বিরাট জায়গীর দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা নিতে অসম্মত হন।

১৮৫৮ সালের এপ্রিলে তিনি 'সদর-উস-সুদুর' পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬১ সালে যখন তিনি মোরাদাবাদে তখন তাঁর পত্নী বিয়োগ ঘটে। সৈয়দের বয়স তখন চুয়াল্লিশ এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা। আত্মীয় স্বজনের সনির্বন্ধতা সত্ত্বেও তিনি আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি।

১৮৬৩ সালে গাজিপুরে অবস্থানকালীন সময়ে সায়েন্টিফিক সোসাইটি

প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালে এটি আলিগড়ে স্থানান্তরিত হয়। এ সময়ে তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬৪ সালে গাজিপুরে তিনি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফারসি এবং সংস্কৃত এই পাঁচটি ভাষায় সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এর কয়েক মাস পরে তিনি আলিগড়ে বদলি হন। এখানে থাকাকালীন তিনি তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ধারাগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। দু-বছর পরে স্মলকজ কোর্ট-এর বিচারক হিসেবে তিনি বারানসীতে আসেন।

১৮৬৯ সালের ১০ এপ্রিল সৈয়দ আহমদ খান ইংল্যান্ড অভিমুখে রওয়ানা হন। এক বছরের কিছু বেশি সময় (সেপ্টেম্বর, ১৮৭০) তিনি সেখানে কাটান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উইলিয়াম ম্যুয়রে (William Muir)-এর লেখা নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী গ্রন্থে যেসব বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবেদন রচনার জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা। লন্ডনের খরচ তাঁকে বহুকষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং তা যথেষ্ট ছিল না। ফলে অচিরেই আর্থিক অভাবের জন্য আরব্ধ কর্ম অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে দেশে ফিরতে হলো। তবে লন্ডনে অবস্থানকালীন সময় তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। লাভ করেন 'কম্পেনিয়ানশিপ অব দি ষ্টার অব ইন্ডিয়া' (৬ আগস্ট ১৮৬৯)। এ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় জাহাজে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী লেখিকা মেরী কার্পেন্টারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর কাছে তিনি রাজার কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক পরিচিত হন। যদিও শিশু বয়সে মুঘল দরবারে তিনি একবার দূর থেকে রাজাকে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদের ইংল্যান্ড সফর আরও একদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে আলিগড়ে অক্সফোর্ডের অনুকরণে তিনি যে কলেজ তৈরি করেছিলেন তারও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন লন্ডনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের ভেতর দিয়েই।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তিনি মুসলমানদের মন থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভীতি দূর করার জন্য 'তাহজিবউল আখলাক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। একই সাথে 'কমিটি ফর দি বেটার ডিভিউশন অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অব লারনিং অ্যামং দি মহামেডান্স অব ইন্ডিয়া' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। তিনি তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিটি মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রস্তাব দেয়। তার মধ্যে মুসলমানদের জন্য একটি কলেজ স্থাপনের কথাও বলা হলো। ১৮৭২ সালের ৯ আগস্ট একটি পত্র মারফত ভারত সচিব

এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে সর্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রস্তাবিত কলেজের উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হলো। এতে হিন্দু ও ইংরেজ সদস্যও ছিলেন। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কমিটির কাছে সৈয়দের পরামর্শ মতো তাঁর পুত্র ভবিষ্যতে কলেজকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার প্রস্তাব রাখলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে এক শ্রেণির রক্ষণশীল অভিজাত মুসলমানরা দারুণভাবে বাধা দিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ নিরুৎসাহ হননি। শারীরিক ও আর্থিক দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেও প্রস্তাবিত কলেজের জন্য তিনি দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেন। অবশেষে ১৮৭৫ সালের ২৪ মে আলিগড়ে 'মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' বা এম. এ. ও. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো।

কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল— প্রথমত, তাঁর শিক্ষা কর্মসূচিতে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন— যদিও এটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর আদর্শ ছিল অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজের মতো আবাসিক মহাবিদ্যালয় এবং তৃতীয়ত, মুসলমানদের জন্য মুখ্যত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও অন্যান্য ভারতীয়রাও শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।

উল্লেখ থাকে, এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বারানসী, ভিজিয়ানা গ্রাম ও পাতিয়ালার মহারাজারাও আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে দু-জন ছিলেন হিন্দু, একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত শিব শংকর এবং অপরজন গণিতের যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কলেজে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৮৩ সালে মুসলমান ছাত্রদের সাহায্যকল্পে একটি ফান্ড অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। উদ্দেশ্য তাঁরা যাতে ইংল্যান্ডে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে পারেন। ১৮৮৬ সালে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে আরও আগ্রহ সঞ্চারের জন্য তিনি স্থাপন করলেন 'মহমেডান এডুকেশোনাল কনফারেন্স'।

ইতিমধ্যে ১৮৭৮ সালে তিনি দু-বছরের জন্য লর্ড লিটন কর্তৃক ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। এ সময়ে তিনি 'ষ্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস'-এর সপক্ষে মতামত উত্থাপন করেন। এর দ্বারা ইংল্যান্ডে সিভিল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত না হয়েও ভারতীয়রা উচ্চপদে আসীন হওয়ার আশা রাখতে পারত।

মাওলানা জামালুদ্দিন আফগানী 'প্যান-ইসলামিক' আন্দোলনে সমর্থন লাভের আশায় এ সময়ে ভারতে আসেন। সৈয়দ আহমদ খান এই আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ভারতীয় মুসলমানদের খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। 'প্যান-ইসলামিক' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি কোনো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের জড়িয়ে পড়াকে অসমীচীন বলে মনে করতেন।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিশেষ কোনো বৈপ্লবিক বক্তব্য ছিল না। তবু তিনি মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনে মুসলমানদের যোগ দেওয়ার মতো উপযুক্ত সময় আসেনি। তিনি নিজেও কংগ্রেসে যোগ দেননি। তথাপি অনেক মুসলমান নেতা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল প্রতিনিধিমূলক পার্লামেন্টীয় প্রথায় ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসনে ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে সংখ্যাধিক্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের সংগঠিত দলের প্রাধান্য স্থাপন। কংগ্রেস জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও স্বাভাবিক কারণে এতে নব জাগ্রত হিন্দুরই প্রভাব অধিক ছিল। সৈয়দ আহমদের আশঙ্কা ছিল যে, উক্ত অধিকার প্রাপ্ত হলে সংখ্যার জোরে হিন্দুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ পদানত থাকবে।

কংগ্রেসের আদর্শের সাথে আরও সক্রিয় বিরোধিতা প্রদর্শনের জন্য তিনি গঠন করলেন 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৮৮ সালে গঠিত এই অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য হলো কংগ্রেস বিরোধী হিন্দু মুসলমান নেতাদের একটি মঞ্চে সমবেত করা এবং তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য পুস্তিকা আকারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা। বলা বাহুল্য অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মুসলমানদের সাথে হিন্দুরাও হলেন। ওই বছরই ব্রিটিশ সরকার সৈয়দ আহমদকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৯ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি এল. এল. ডি. ডিগ্রিতে সম্মানিত করেন। ১৮৯৩ সালে এম. এ. ও কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়োডর বেক প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন।' স্যার সৈয়দ তার উৎসাহী সদস্য হলেন। অ্যাসোসিয়েশন মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র

রাজনৈতিক দাবি তুলে ধরে এবং তৎকালীন হিন্দুদের গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

১৮৯৮ সালের ২৭ মার্চ স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড়ে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন শক্ত হয়ে বসেছে তখন তার লক্ষ্য হলো শিল্প বিপ্লব থেকে উদ্ভূত ব্রিটেনের কল-কারখানায় প্রস্তুত পণ্য সামগ্রী এদেশের বাজারে একচেটিয়াভাবে বিক্রি করা। প্রকৃতপক্ষে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক প্রধান বাজারে পরিণত হলো। তৈরি হলো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত লিবারেল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণির। এঁরা যেমন একদিকে প্রাচীন ধর্ম ও জ্ঞান চর্চার প্রতি অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করলেন তেমনই অন্যদিকে ইংরেজের লাভের হিসেব রক্ষার জন্য কলমনবিশিতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন। অবশ্য এঁদের কেউ কেউ আবার পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে প্রাচ্যের ঐতিহ্যের একটা ভাববাদী সমন্বয় ঘটাবারও চেষ্টা করলেন।

ইংরেজ আধিপত্যের প্রথম যুগে ইসলাম তথা মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তমিত গৌরবের রশ্মিতে গৌরবান্বিত বোধ করে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত মুসলমানেরা ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ক্রান্তিকালে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় (৮ আগস্ট, ১৮৫৩) 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেন যে, যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু তা সমস্তই প্রায় ধ্বংস করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এই ধ্বংসের কাহিনিতে কলঙ্কিত 'তাহলেও স্বীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণ শুরু হয়েছে।'

অর্থনীতিবিদ মরিস ডব তাঁর '*পলিটিক্যাল ইকনমি অ্যান্ড ক্যাপিট্যালিজম*' গ্রন্থে লিখেছেন, সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা হলো, উপনিবেশের সামাজিক কাঠামো সেইভাবে গড়ে তোলা যেভাবে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক যুগে অন্যান্য দেশগুলিতে এই শ্রেণিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। শ্রম মূলধন নিয়োগ করার পূর্বে প্রথমে প্রয়োজন গ্রাম্য প্রলেতারিয়েত। শ্রম শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল, জমি ব্যবসায়ী থেকে শিল্পোদ্যোগী

পুঁজিপতি পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে।[২] ঐতিহাসিক নিয়মে ঔপনিবেশিক ভারতেও এর অন্যথা ঘটেনি। তৈরি হলো বণিক, মুৎসুদ্দি দালাল থেকে এক নতুন জমি ব্যবসায়ী এবং অন্যদিকে জমিহীন খেতমজুর।

১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে ইংরেজরা ভারতের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। ভারতের সমস্ত কৃষি জমিকে যথাক্রমে জমিদারি বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (পূর্বভারত থেকে উত্তর ভারতের বারানসী পর্যন্ত), রায়তওয়ারি (পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারতের নতুন অধিকৃত অঞ্চল, ১৮১৮-১৮২৩ সালের মধ্যে) এবং মহলোওয়ারি (বর্তমান উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, ১৮৩৩ সাল) বন্দোবস্তের আওতায় আনা হলো। কিন্তু এই তিন প্রথাতেই শোষণমূলক উদ্দেশ্য থাকায় কৃষকের হলো সর্বনাশ।[৩] কারণ কোম্পানি ব্রিটিশ ভারতকে তাদের মহল বা জমিদারি বলে ধরে নিয়েছিল এবং জমির আয় ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে লাভজনক উৎস। ফলে কৃষকগণ দিন মজুরের অবস্থায় যেমন পরিণত হলো তেমনই অনেক পুরোনো বনেদি জমিদার শ্রেণি বর্ধিত রাজস্বের চাপে তাঁদের জমির অধিকার হারালেন। ভারতের অধিকাংশ স্থানে নতুন যে জমিদার শ্রেণি গড়ে উঠল এবং তাদের উপর নির্ভর করে যে মধ্যস্বত্বভোগীর দল সমাজে মধ্যবিত্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু নগণ্য হলেও তাঁরা হিন্দুদের মতো হয়তো আপন সমাজে তবু কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন—অথচ সৈয়দ আহমদের পূর্বে মুসলমান সমাজে সেই ভূমিকায় অবর্তীণ হতে আর কাউকে দেখা যায়নি।

ইংরেজ আমলের শুরুতেই এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ইংরেজরা করেনি। নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। বরং তারা উৎসাহ দিয়েছিল সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি শিক্ষা প্রসারে। কিন্তু ভারতে যখন তাদের সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হলো, প্রশাসনকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজন পড়ল আরও বেশি সংখ্যায় এদেশীয় লোকের সাহায্যের। ইংরেজি শিক্ষা প্রসার ছাড়া আর কোনো উপায়ান্তর রইল না। ১৮৩৪ সালে ভারতে ইংরেজ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন : 'অতঃপর এদেশে ইংরেজি ভাষার

---

২. পলিটিক্যাল ইকনমি অ্যান্ড ক্যাপিট্যালিজম; মরিস ডব; পৃ. ২৪৮

৩. এ হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া, কে. আনতোনোভা, জি. বনগার্ড-লেভিন, জি. কটোভস্কি; মস্কো, ১৯৭৮; পৃ. ৫০-৫২।

মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারই সরকারি নীতি বলে গৃহীত হবে এবং শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অর্থ এই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হবে।' ১৮৩৯ সালে লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শ্রেণিতে শিক্ষা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন। জেলা স্কুলগুলিতে ইংরেজিই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গণ্য হলো।

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন, যারা সরকারি বিদ্যালয় থেকে পাশ করবে তাদের মধ্য থেকেই সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। এমনকি নিম্নতম চাকুরির ক্ষেত্রেও যে কিছুটা ইংরেজি জানে তার আবেদন অগ্রাধিকার পাবে। স্বভাবতই ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা পুরোপুরি নিলেন। অন্যদিকে ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজের ইংরেজ বিদ্বেষ তাঁদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে বিমুখ করল। উল্লেখ্য, ১৮৩৪ সালের প্রায় সতেরো বছর আগে কলকাতায় ইংরেজ সরকারের অনুমতিক্রমে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে। প্রতিষ্ঠাতা বাঙালিদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সহযোগী এবং জমিদার, ওই সময়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুব্যতীত ওই কলেজে আর কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। মুসলমানদের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।[৪]

পশ্চিম ভারতেও ইংরেজ ব্যবসায়ের সহযোগী, ছোটো খাটো শিল্পোদ্যোগের মালিক পার্শি সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে হিন্দু ও পার্শি নব্য বুর্জোয়া এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা যেভাবে এগিয়ে এলেন, মুসলমানরা সমভাবেই পিছিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে ইংরেজি শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বার আরও উন্মুক্ত হয়ে গেল। হিন্দুদের মতো ভারতীয় মুসলমানদের সামনেও এক নতুন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা

---

৪. "...after 1855 when the Hindu College became Presidency College open to all creeds and communities" ভবতোষ দত্ত, "প্রেসিডেন্সী কলেজ, ক্যালকাটা", জার্নাল অব হায়ার এডুকেশন; ১৯৭৮, ভল্যুম-৪, নং-২, পৃ.-১৪৫। কলেজের নিয়মাবলিতে পরিষ্কার লেখা হয়েছিল শিক্ষা দেওয়া হবে কেবল "Respectable Hindus" দের– যারা সে আমলে মাসে পাঁচ টাকা করে মাহিনা দিতে পারবে। অর্থাৎ শুধু উচ্চবর্ণ নয় ধনবান হওয়াও চাই। ড. দত্ত উপরোক্ত প্রবন্ধে বলেছেন ১৮৫৫ সালের পূর্বে "the prohibition against the entry of Non-Hindus as students was positive"

দেখা দিলো। সংখ্যায় স্বল্প হলেও লিবারেল মুসলমান, জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও ইংরেজদের তল্পীবাহকদের পক্ষে নিষ্ফল আক্রোশ আর পুরোনো সংস্কার আঁকড়ে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের কোনো উদ্যম কারুর মধ্যে দেখা যায়নি। কারণ ব্রিটিশদের কাছ থেকে যদি কোনো অর্থনৈতিক সুবিধালাভ করা যায় তবে তা উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত গোষ্ঠী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা ব্যবস্থাকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অ-ব্রাহ্মণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকারের সুপারিশ করেও শেষ পর্যন্ত কায়স্থদের বাহিরে তার প্রয়োগ তিনি অনুমোদন করেননি। নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের পরিচয় করানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি'। আর মুঘল রাজবংশের আনুকুল্যে বর্ধিত সৈয়দ আহমদ সিপাহি বিদ্রোহে ইংরেজদের হাতে নিহত মোরাদাবাদের অভিজাত মুসলমান পরিবারের জন্য ব্যথিত হন। তিনি অভিজাতদের স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্বন্ধে চিরকাল সচেতন ছিলেন।[৫]

অবশ্য ইংরেজি শিক্ষার দৌড়ে অভিজাত ও জমিদার মুসলমানরাও হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিলেন। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে দেখা গেল যে, সেখানে আবেদনকারীদের মধ্যে ইংরেজি জানা উপযুক্ত এমন একটি মুসলমান ছাত্র ছিল না যাকে ভর্তি করা যায়।[৬] এর

---

৫. 'আমার মতে উচ্চশ্রেণির শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা করলে সরকারের উদ্দেশ্য অনেক বেশি সফল হবে।' ১৮৫৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সরকারের কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি। দ্রষ্টব্য, বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ; বিনয় ঘোষ; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭; কলকাতা, ১৩৬৬।

পূর্ববাংলার সংস্কৃতির সংকট; বদরুদ্দীন উমর; পৃ. ১৪; কলকাতা, ১৯৭১। কে এ নিজামী; পৃ. ৪৭।

১৮৮৭ সালে ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর বক্তৃতা। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে মনোনয়নের সপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন এবং সাধারণ বংশের কোনো ব্যক্তিকে গ্রহণ না করার অনুকূলে বক্তৃতা। উদ্ধৃতির জন্য, হানস কোনের 'প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস,' দ্রষ্টব্য, আত্মচরিত; জওহরলাল নেহেরু (অনুবাদ); পৃ. ৪৯৪-৪৯৫; কলকাতা-১৩৫৫।

'He (i,e Sayyid Ahmad Khan) only wanted the backwardness of the Muslim middle and upper classes to go. দ্র. মডার্ণ ইন্ডিয়া, বিপান চন্দ্র; পৃ. ২২২ (এন. সি. ঈ. আর. টি, দিল্লি, ১৯৭১)

৬. সোশ্যাল আইডিয়াজ অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল (১৮১৮-১৮৩৫); এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমদ, পৃ. ১৪৭।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও অবস্থার বিশেষ হেরফের দেখা যায় না। ১৮৮৪ সালে যখন কিছু মুসলমান নেতা একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করতে মনস্থ করেন, তখন সৈয়দ আহমদ বলেছেন সারা ভারত খুঁজেও একজন শিক্ষিত মুসলমান পাওয়া গেল না যাঁর সম্পাদনা করার যোগ্যতা আছে।[৭]

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান সমাজের কাছে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রচারের চেষ্টার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তি ও চাকুরির ক্ষেত্রে যে বিরাট অচলায়তনটি অন্তরায় সৃষ্টি করছিল তাকে সরাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। অবশ্য আলিগড় কলেজের গোড়ার দিকে আর্থিক কারণে সাধারণ মুসলমান পরিবারের ছাত্রদের পড়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না—যেমনটি ওঠেনি হিন্দুদের ক্ষেত্রেও। তাছাড়া সাধারণভাবেও হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের আর্থিক কাঠামো আরও জরাজীর্ণ ছিল। ১৮৩৬ সালে হুগলীতে ইংরেজি কলেজ স্থাপিত হলেও সাধারণ মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এর প্রধান কারণ হুগলী শহরে এসে পড়াশোনার খরচ তাদের পক্ষে চালানো সম্ভব ছিল না। উত্তর ভারতের সিপাহি বিদ্রোহোত্তর যুগে রাজনৈতিক কারণেই মুসলমানরা আরও দরিদ্র হয়ে পড়েছিল।

তথ্যের দিক থেকে বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের কাজে সৈয়দ আহমদের চেয়ে কয়েক বছর এগিয়ে ছিলেন। ১৮৫৩ সালে তিনি 'মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা কতখানি সুবিধাজনক' এই শিরোনামে একটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এর জন্য তাঁকে অনেক স্বধর্মীয় মৌলপন্থিদের কাছে নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হয়। তবে আবদুল লতিফ সৈয়দ আহমদের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে সরাসরি ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষাপাতী

৭. কে এ. নিজামী, পৃ. ৯০।

জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৩৪) তাঁর 'আত্মচরিতে' বাল্যকালের বয়স্কসঙ্গী পিতার মুনশি মোবারক আলি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন বাদায়ূনের এক ধনী পরিবারের বংশধর। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে এই পরিবারের সর্বনাশ হয়। ইংরেজরা পরিবারের অনেককেই সমূলে উৎসন্ন করেছিলেন। দ্র. জওহরলাল নেহেরু. পৃ. ৯। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা; কাজী আবদুল মান্নান, পৃ. ৫৫, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮৮২ সালে গঠিত হান্টার কমিশন মুসলমানদের শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার জন্য তাঁদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে দায়ী করেছিলেন। ১৮৭১ সালের ১৯ অক্টোবর কলকাতায় লেখা হেনরি ব্লচম্যানের এক চিঠি থেকে জানা যায় কীভাবে 'মদদ-ই মাস' জমিগুলি (রাষ্ট্রীয় সাহায্যে) ইংরেজরা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে অনেক প্রাচীন গৌরবশীল মুসলমান পরিবার দুর্দশার শেষ সীমানায় পৌঁছেছেন। দ্রষ্টব্য, এডুকেশন্যাল প্রসিডিংস; আগস্ট, ১৮৮২; গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল।

ছিলেন না। তিনি ছিলেন গতানুগতিক মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষপাতী। ১৮৬৪ সালে সৈয়দ আহমদ গাজিপুরে যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে ইংরেজির মাধ্যমেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

অবশ্য একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, আবদুল লতিফ বা সৈয়দ আহমদের পূর্বে অন্য কোনো মুসলমান বুদ্ধিজীবী ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব অনুভব করেননি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে এ ধরনের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কিছু কম ছিল না—আর এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন আবদুল রহিম দাহরী (১৭৮৫-১৮৫০)। আবদুল রহিম যে জীবন একদিন শুরু করেছিলেন দিল্লির ধর্মগুরু শাহ আবুল আজিজের শিষ্যত্বের ভেতর দিয়ে তার যবনিকাপাত ঘটেছিল কলকাতায় এসে শুধু ইংরেজি ভাষা চর্চা দিয়ে নব-ইউরোপীয় কায়দায় জীবন যাপন অতিবাহিত (মদ্যপান, নৃত্য-গীতের আসর) করার মধ্য দিয়েও। যিনি আরবি, ফারসি ছাড়া কিছু জানতেন না তিনি পরম যত্ন নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত ড. মার্টিনের কাছে ইংরেজি ভাষায় পাঠ নিলেন। অনুবাদ করলেন মূল্যবান সব গ্রন্থ ইংরেজি থেকে ফারসিতে। ব্রিটিশ রাজের এক গুণমুগ্ধ প্রজা হিসেবে লর্ড হেষ্টিংসের কাছে ইংরেজি ভাষা প্রচারের আবেদন জানিয়ে আবেদনপত্রও রচনা করেছিলেন। শেষের দিকে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজি পাঠ শিক্ষা দিতেন—আরবি, ফারসি পুথিগুলোর কোনো খোঁজ রাখতেন না।

মৌলানা আবদুল রহিমের সাথে আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আহমদের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য ছিল এই যে, শেষোক্ত দু-জন যেখানে ইংরেজি জ্ঞান চর্চা প্রচারে 'মিশনারী'দের মতো বিরামহীন কর্মী, সেখানে প্রথমোক্তের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভালোলাগায় পর্যবসিত।[৮]

তাছাড়া যেহেতু আবদুল রহিমের জীবনযাত্রা ইসলামি শাস্ত্র বহির্ভূত ছিল, এ কারণে তিনি যদি প্রচারকও হতেন তাহলেও তা শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত সমাজে কখনোই সহানুভূতিশীল শ্রোতা খুঁজে পেত না। তবে কৌতূহলের বিষয় আবদুল রহিমের মতো সৈয়দ আহমদ এবং আবদুল লতিফও ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারী। আবদুল লতিফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর সৈয়দ আহমদ ছিলেন গাজিপুরের প্রধান সদর আমিন। অবশ্য ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উৎসাহী সমর্থক

---

৮. ১৭৮৫ সালে মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মাদ্রাসায় একটি ইংরেজি বিভাগ খোলা হয় ১৮২৯ সালে। কিন্তু ড. দত্তর মতে "the experiment jailed to achieve good result" ভবতোষ দত্ত; ১৪৮।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুৎসুদ্দী এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন (১৮২১-১৮৯১ খ্রি.) সরকারি কলেজের (সংস্কৃত কলেজ) অধ্যক্ষ ও সহকারী ইন্সপেক্টর অব স্কুল।

১৮৬৩ সালে সৈয়দ আহমদ কলকাতায় আসেন এবং নবাব আবদুল লতিফের আয়োজিত একটি সভায় মিলিত হন। তৎকালীন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার ২৬ অক্টোবরের সংখ্যায় ওই সভার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে যেহেতু বাণিজ্য এবং আদালতের প্রধান ভাষা হিসেবে ইংরেজি চালু হয়েছে সেহেতু মুসলমান এবং সরকার—উভয়ের কল্যাণে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা প্রচারিত হওয়া উচিত।

অবশ্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রথম যুগেও ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কিছু শব্দজ্ঞান অর্জন করা আর প্রধানত ইংরেজিতে জমা খরচ রাখতে শেখা।[৯]

অভিজাত মুসলমান পরিবারের সন্তান হিসেবে সৈয়দ আহমদ উপলব্ধি করেছিলেন আর্থিক অনটন নয়—ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস প্রধানত মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিমুখ করে রেখেছে।[১০] ওয়াহাবী আন্দোলন ও সিপাহি বিদ্রোহ এই দুটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নতুন ব্যাখ্যা ইংরেজ সরকারের কাছে রাখলেন। তিনি বললেন, ওয়াহাবী আন্দোলন মূলত ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন, তাঁর মতে 'প্রকৃত ওয়াহাবী মতবাদ কখনো ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী নয়।' ১৮৫৮ সালে উর্দুতে লেখা *'সিপাহি বিদ্রোহের কারণ'* নামক পুস্তকে তাঁর বক্তব্য— বিদ্রোহের কারণ সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং সরকারের তরফে তাঁদের ঐতিহ্যের উপর আঘাত। তিনি মনে করতেন না লর্ড ডালহৌসীর 'স্বত্ব বিলোপ' নীতির ফলে অযোধ্যা দখলের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানরা দিল্লির বাদশাহের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হিন্দুদের নেতৃত্বকে

---

৯. জনবুল, ১৮ জানুয়ারি, ১৮৩১। ১৮৩০ সালের ২৭ মার্চ 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের (অর্থাৎ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় তেরো বছর পরে) একটি পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের কেউ দেওয়ানের ছেলে, কেরানির ভাই, খাজাঞ্চির ভাইপো অথবা নীলামদারের নাতি। দ্রষ্টব্য, সংবাদপত্রে সেকালের কথা; প্রথম খণ্ড; সম্পাদনা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০. 'I still remember the days when, in respectable families the study of English, with the object of obtaining a post in Government service or of obtaining any other lucrative employment was considered highly discreditable' সৈয়দ আহমদের উক্তি। দ্র. কে. এ. নিজামী, পৃ. ৮৭-৮৮।

দায়ী করেছিলেন। ১৮৬০ সালে তাঁর প্রকাশিত 'দি লয়্যাল মহমেডানস্ অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে মুসলমানরা খুব ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন না। তিনি দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, ইসলামের সাথে খ্রিষ্টধর্মীয়দের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বহুশত বছরের পুরোনো। 'ইসলামের মতো বিশ্বে আর কোনো ধর্ম খ্রিষ্টধর্মের প্রতি এত বেশি বন্ধুত্বের নয়।' '*তবিয়িন-উল-কালাম*' (tabyin-ul-kalam) বইতে কুরআন ও বাইবেলের মধ্যে সাদৃশ্য দেখাবারও চেষ্টা করলেন। একই সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা চর্চা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভের আবশ্যকতার গুরুত্ব তিনি নিরলসভাবে প্রচার কররেন। এর জন্য রক্ষণশীল চরমপন্থিদের তিনি বিরাগভাজন হন এবং এক সময়ে তাঁর জীবন বিপন্নও হয়ে পড়েছিল।

সৈয়দ আহমদ মাদ্রাসার পুরোনো শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ১৮৫৯ সালে মোরাদাবাদে একটি ফরাসি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই উপলক্ষে তিনি যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। সরকারি ভার্নাকুলার স্কুলগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে ওগুলি বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষাদানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। গাজীপুরে 'সায়েন্টিফিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি লেখা প্রকৃত জ্ঞানের পুস্তকগুলিকে অনুবাদের মাধ্যমে উর্দুভাষী মুসলমানদের সামনে হাজির করা। এগুলি পাঠ করে তাঁরা যাতে মূল ইংরেজি শিখতে উৎসাহী হন। ইংরেজি ভাষায় শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চা নয়, বিজ্ঞানের দিকেও তাঁর নজর ছিল। 'কমিটি ফর দি বেটার ডিফিউশন অ্যান্ড অ্যাডভানস্মেন্ট অব লারনিং অ্যামং দি মহমেডানস্ অব ইন্ডিয়া'র সেক্রেটারি হিসেবে তার অন্যতম অনুসন্ধানের বিষয় ছিল, কেন মুসলমানরা নব্য বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হচ্ছে না? বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেগুলি হলো— মেকানিকস, ম্যাথমেটিকস, ইলেকট্রিসিটি, নিউম্যাট্রিকস এবং মডার্ন ফারমিং। এই সমস্ত বিষয়ের উপর লেখা কিছু ইংরেজি উত্তম পুস্তকও তিনি উর্দুতে অনুবাদ করান।

কিন্তু সৈয়দ আহমদের ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের মধ্যে অতি উৎসাহ এবং স্ববিরোধিতাও লক্ষণীয়। একদিকে উর্দুভাষার উন্নতির দিকে তিনি যেমন নজর দিয়েছিলেন এবং একসময়ে উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কথাও চিন্তা করেছিলেন— তেমনি অপরদিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোনো ভারতীয় ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ১৮৮২ সালে এডুকেশন কমিশনের

সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি জানান, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা উচিত ছিল বলে তাঁর যে পূর্বে ধারণা ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার ঘটে না। অথচ বিদ্যাসাগর তাঁরই সমসাময়িক হয়েও এ ব্যাপারে অনেক আধুনিক স্বাধীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মনন ও মূল্যবোধের বাহন ইংরেজি হতে পারে না, হবে মাতৃভাষা। সেজন্য তিনি প্রথম হতেই বাংলা স্কুল স্থাপনের বেশি পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৫৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ছোটোলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডের নিকট বিদ্যাসাগর এক শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা পেশ করেন। তাতে তিনি বলেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং শরীর বিজ্ঞানও বাংলায় শেখানো প্রয়োজন।[১১] মাদ্রাসাগুলি থেকে ইংরেজিতে শিক্ষাদানের যে প্রস্তাব সৈয়দ আহমদ রেখে ছিলেন তা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কতটা ফলপ্রসু হতো সে ব্যাপারে তর্কের অবকাশ আছে। তাছাড়া শিশু ও কিশোর মন পরিবেশ-নিরপেক্ষ একটা বিদেশি ভাষার পক্ষে কতটা অনুকূল সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

ইসলামি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেও স্যার সৈয়দের প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার কোনো ভূমিকা ছিল না। বোধগম্য কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি জ্ঞান চর্চা প্রসারের উপর জোর দিলেও হিন্দুরা তাঁর চিন্তার বাইরে কখনো যায়নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্টিফিক সোসাইটির' সদস্যদের মধ্যে হিন্দুরাও মুসলমানদের পাশাপাশি ছিলেন। আলিগড় এম.এ.ও কলেজের দরজাও অন্যান্য ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কলেজের পাঠ্য তালিকায় আরবি, ফারসির সাথে সংস্কৃত পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। কলেজ প্রদত্ত মেধাবী বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী হিন্দু মুসলমান উভয়েই ছিল। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের যে চেষ্টা স্যার সৈয়দ আহমদ খান করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় তৎকালীন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায়। ১৮৭১ সালের ২৩ অক্টোবর এক নিবন্ধে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে সরকারি ঔদাসিন্যের সমালোচনা করা

---

১১. সৈয়দ আহমদের সাক্ষ্য; দ্র. কে. এ. নিজামী; পৃ. ৮৮ 'He (i. e, Sayyid Ahmad Khan) advised the Government to provide instruction in the English language so that the Indians could derive real advantage from it' কে. এ. নিজামী; পৃ. ৭০। 'নিজে অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি হলেও তিনি (সৈয়দ আহমদ খাঁ) সরাসরি ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী ছিলেন।' বদরুদ্দীন উমর; পৃ. ১২।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা, দ্র. বিনয় ঘোষ; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮।

হয়। তারপর ইংরেজ-সম্পাদক মশায় প্রস্তাব দেন মুসলমানদের জন্য সরকারি বিদ্যালয় স্থাপনের এবং সেই সকল বিদ্যালয়ে যেন হিন্দু অথবা খ্রিষ্টান শিক্ষক নিযুক্ত না হয়।

উল্লেখ্য এর চার বছরের মধ্যে সৈয়দ আহমদ প্রধানত মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ১৮৭৫ সালের ২৪ মে আলিগড়ে যে কলেজ স্থাপন করেন তাতে কিন্তু তিনি 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকের দেওয়া প্রস্তাবের উল্টো কাজই করেছিলেন। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বধর্ম সমন্বয়ই ঘটানো হয়েছিল।

কিন্তু যেভাবে তিনি পুরুষদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ উৎসাহ কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণ মুসলমান মহিলাদের কথা তো বাদই দেওয়া গেল, এমনকি অভিজাত পরিবারের মহিলারাও তাঁর মতে গৃহে যেটুকু আরবি, ফারসি ও উর্দুতে নীতিশিক্ষা লাভ করেন তাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন 'সরকারের পক্ষে মুসলমানদের মধ্যে যদি স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা হয় তাহলে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।'[১২] অথচ ইংল্যান্ড থাকাকালীন সেখানকার মহিলাদের বোরখাহীন প্রকাশ্য জীবনযাত্রা এবং সাহিত্য অনুসন্ধিৎসা তাঁকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও মিস কার্পেন্টার প্রস্তাবিত স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছোটোলাট উইলিয়াম গ্রের কাছে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেন। ১৮৬৭ সালে ১ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর জানান যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এ রকম কোনো শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি। বিদ্যাসাগরের তখন বয়স প্রায় একান্ন।[১৩]

সামন্ততান্ত্রিক পরিবার থেকে আগত সৈয়দ আহমদের প্রধান কর্মতৎপরতার কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারত। উনিশ শতকের শেষভাগে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় যে ধরনের শিল্পোন্নয়ন ঘটেছিল তার কিছুমাত্র উন্নয়নও উত্তর ভারতে ঘটেনি। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজে সুতিবস্ত্রশিল্প ও কলকাতায় পাটশিল্প ব্রিটিশ পুঁজির প্রধান

---

১২. "Any endeavours on the part of Government," He (Sayyid Ahmad Khan) remarked, "to introduce female education among Mohammadans will, under the present social circumstances, prove a complete failure" দ্র. কে. এ. নিজামী; পৃ. ৮৮।

১৩. বিনয় ঘোষ; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

বিনিয়োগ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি কোথাও কোথাও শ্রমিক বিক্ষোভের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই এবং মাদ্রাজে পঁচিশটির বেশি ধর্মঘট হলো। অন্যদিকে রেলপথের বিস্তারের (১৯০০ সালের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল রেলপথ নির্মিত হয়) ফলে চা, কফি, রবার শিল্পের উন্নতি ঘটল ব্রিটিশ পুঁজির দৌলতে। কিন্তু সেইসাথে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কিছুমাত্র উন্নত হলো না। শোষণ ও নিগ্রহের জ্বলন্ত রূপ (বারো ঘন্টারও বেশি কাজ, চাকুরিতে ছাঁটাই, অত্যন্ত স্বল্প বেতন ইত্যাদি) সৈয়দ আহমদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত ছিল না। তিনি দেখেছিলেন শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর ব্যবহারিক সুবিধার দিকটা, অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে। মার্কস ভারতে ব্রিটিশ মালিক শ্রেণির রেলপথ নির্মাণের ফলপ্রসু হিসেবে বলেছিলেন, যেসব আধুনিক শ্রম শিল্পের বিকাশ হবে তার আঘাতে ভারতের অগ্রগতির পথের অন্তরায়গুলি একে একে দূর হয়ে যাবে। ভারতের বর্ণ গোঁড়ামি, গ্রাম সমাজের জড়তা, কুপমণ্ডুক বৃত্তি সব ভেঙে যাবে।[১৪] কিন্তু উত্তর ভারতে মার্কস কথিত আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশ উনিশ শতকের শেষভাগেও দূরাগত ছিল।

সৈয়দ আহমদ লক্ষ্য করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের নিশ্চিত আধিপত্য। আর ব্যথিত হয়েছিলেন সামরিক শিক্ষায় অপটু, অশিক্ষিত, বিশৃঙ্খল ওয়াহাবী এবং সিপাহিদের চরম ব্যর্থতা দেখে। সৈয়দ আহমদের সমাজভাবনা ও রাজনৈতিক মতামত এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছিল। এর বাইরে যাওয়ার মতো কল্পনাপ্রবণ আদর্শবাদী তিনি ছিলেন না। তাই ব্রিটিশদের সহযোগিতার উপর আস্থা রেখে জাতীয় কংগ্রেসের পাল্টা 'ইন্ডিয়ান ইউনাইটেড পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে থিয়োডর বেকের প্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতে ইঙ্গ-ভারতীয় (মুসলিম) প্রতিরক্ষা সমিতির তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক—তথাপি মহম্মদ আলি জিন্নার মতো মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অথবা দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেননি। ১৮৬৪ সালের ২৭ জানুয়ারি গুরুদাসপুরে তিনি এক বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন 'হিন্দু' এবং 'মুসলমান' শব্দ দুটি শুধু ধর্মের পার্থক্য বোঝায়। তা নাহলে সবাই—হিন্দু অথবা মুসলমান এমনকি খ্রিষ্টান যারাই এদেশে বাস করে সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

---

১৪. 'ফিউচার রেজাল্টস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া'; কার্ল মার্কস (প্রবন্ধ, নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন, ১৮৫৩); মার্কস্-এঙ্গেলস্ অন ব্রিটেন; মস্কো, ১৯৫৩।

সৈয়দ আহমদের সামাজিক সংস্কারের মূল বক্তব্য ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তাঁর জীবনের কোথাও তিনি ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেননি। তাঁর মতে ধর্ম মানব সমাজের অগ্রগতিকে সাহায্য করে। তবে তিনি ধর্মকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ এবং ইচ্ছামতো বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি সামাজিক দোষ সম্পর্কে সচেতন করাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বাধ্যতামূলক টিকাদান ব্যবস্থা ধর্মের স্পর্শকাতরতার উপর আঘাত করবে বলে লোকমান্য তিলক প্লেগের টিকাদান ব্যবস্থাকে যেখানে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন সেখানে দেখা যায় সৈয়দ আহমদ লর্ড রিপনের কাউন্সিল সদস্য হিসাবে 'বাধ্যতামূলক টিকাদান বিল'-কে শুধু সমর্থন করেননি, তার খসড়াও তৈরি করেছিলেন। তিনি বলতেন 'চিন্তার স্বাধীনতার বিকাশ না ঘটলে সুসভ্য জীবন হতে পারে না।' কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতার যে আঁচল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল তার বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদের লড়াই দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি ধর্মের সে সব ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন যেগুলির পিছনে ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুমোদন নাই— যা সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে অন্তরায় ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় অনুমোদনযোগ্য নয় এমন কোনো সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে বিমুখ।

বলা বাহুল্য, এর ফলে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে তা কেবল এক বিশেষ ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে। অবশ্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানবিকতাও ধর্মাচ্ছন্ন ছিল এবং ব্যবহারিক আচরণও স্ববিরোধিতা মুক্ত ছিল না। রামমোহন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও জীবনের শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে উপবীত ধারণ করেছিলেন। এমনকি বিদেশে যাওয়ার সময়ে গোঁড়া হিন্দুর মতো জাহাজে নিজের কক্ষে তাঁর ব্রাহ্মণ পাচকের প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করতেন। রামমোহন জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করলেও (১৮২১) তার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি যেমনটি করেছিলেন সতীদাহ বিরোধী মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে। বিধবার বিবাহ তাঁর নিকট সদাচার বলে বোধ হয়নি, যদিও বিশেষ কতগুলি ক্ষেত্রে তিনি তা অনুমোদন করেছিলেন। তিনি ছিলেন শৈব বিবাহের সমর্থক। প্রচলিত হিন্দু সামাজিক আচরণগুলি রামমোহন নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। ব্রাহ্মণের উপবীতকে তিনি কখনো বর্জন করেননি। তাঁর সময়ে ব্রাহ্ম সভায়

বেদ পাঠের অধিকার কেবল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট ব্রাহ্ম সমাজের উদ্বোধন হয়েছিল। তিন দিন পরে ২৩ আগস্ট কলকাতা জনবুল লিখলেন, অনুষ্ঠানে বেদ পাঠ করা হয়েছিল পাশের ঘর থেকে যাতে করে অব্রাহ্মণ শ্রোতাদের উপস্থিতি কলুষিত না করতে পারে... 'Veds may not be desecrated by being in the same apartment with the profane vulgers of hearers.' জনবুলের এই সংবাদের কোনো প্রতিবাদপত্র বেরিয়েছিল বলে শোনা যায়নি। রামমোহন যেমন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন তেমনই বিদ্যাসাগর করেছিলেন বিধবা-বিবাহের সপক্ষে। লর্ড ড্যালহৌসি যখন বিধবা বিবাহের জন্য আইন প্রণয়ন (১৮৫৬) করলেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যাসাগর তার সোচ্চার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু লর্ড বেন্টিংক যখন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে (১৮২৯) আইন প্রণয়ন করতে উদ্যোগী হলেন তখন রামমোহন তাঁকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল দেশের লোক সব বুঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত আইনের বিষময় ফল ঘটবে। দেশের লোক আতঙ্কিত হবে 'any public enactment would give rise to general apprehension.' সুখের বিষয় বেন্টিংক সে পরামর্শ নেননি। তা না হলে অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের আতঙ্ক অপনোদন করতেই ক'শো বছর কেটে যেত কে জানে!

যে-কোনো সামাজিক সংস্কারেরই একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকে কিন্তু সেই আশঙ্কায় কোনো সংস্কারমূলক আইন অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। রামমোহনের জীবনী গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" কর্তৃক প্রকাশিত বইতে রামমোহনের যুক্তির সমর্থনে ১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহে সিপাহি ও জনসাধারণের অংশগ্রহণের কাহিনিকে টেনে এনেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সাক্ষী খাড়া করেছেন ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের "১৮৫৭"-র বইটিকে যিনি আবার স্বচ্ছন্দে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বক্তব্যকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মহাবিদ্রোহের সমসাময়িক বিদ্যাসাগর মশায় সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমাজে লক্ষ্য করেননি। ১৮৪৮ সালে লেখা *'বাংলার ইতিহাস'* বইতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "বহুকাল অতীত হইল, সহমরণ রহিত হইয়াছে; এই দীর্ঘকাল মধ্যে, প্রজাদিগের অসন্তোষের কোনোও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

ফলত এখানে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন।"[১৫] আবার অন্যদিকে আশ্চর্য লাগে বাল্য বিবাহের বিরোধী হয়েও ধর্মীয় হস্তক্ষেপের কথা বলে বিদ্যাসাগর সহবাস সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। অথচ এই বিদ্যাসাগরই বেদকে ভ্রান্ত বলতে ভীত নন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয়ী নন, যেখানে রামমোহন কেবল বেদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েই ক্ষান্ত হন এবং ঈশ্বরে সংশয়ীদের বিরুদ্ধে নির্মম শ্লেষ প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না।

ইংরেজি ভাষায় প্রায় অজ্ঞ হয়েও ইংরেজির গুণাগুণ প্রচারে যেখানে সৈয়দ আহমদ অক্লান্ত পরিশ্রমী, সেখানে হতাশ হতে হয় যখন দেখা যায় সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নে তিনি তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধের উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না। ধর্ম যেখানে সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থি নয় সেখানেও তার প্রয়াস সীমাবদ্ধ। মহাজনি প্রথা, সুরাপান, জুয়া খেলা প্রভৃতি অধার্মিক ক্রিয়া কলাপে কোনোরকম ভাটা পড়েছিল বলে নিশ্চয় দাবি করা যাবে না। অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ এবং তালাকের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। এটি এক নিষ্ঠুর সত্য যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মামুদ অতিরিক্ত সুরাপানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরই নিযুক্ত কলেজের বিশ্বস্ত প্রধান করণিক তাঁর ও অন্যান্য ট্রাষ্টদের সহি জাল করে কলেজের প্রায় লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করে তাঁর অশেষ মানসিক কষ্টের কারণ হয়েছিল।[১৬]

পাশ্চাত্য জ্ঞানের ফলে বিজ্ঞানসম্মত যে যুক্তিবোধ সামন্ততান্ত্রিকতার উপরিসৌধকে টলিয়ে দিতে পারে সে লক্ষ্য সৈয়দ আহমদসহ উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী উভয় সম্প্রদায়ের কারুর ছিল না।

পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে ইউরোপে নতুন করে যুক্তি

---

১৫. দি লাইফ অ্যান্ড লেটার্স অব রাজা রামমোহন রায়; দিলীপ কুমার বিশ্বাস এবং প্রভাত চন্দ্র গাঙ্গুলী (সম্পাদিত); কলকাতা, ১৯৬২; পৃ. ২১৩-২৩২, এবং ২৫৭-২৫৮। অন রামমোহন রায়; রমেশচন্দ্র মজুমদার; কলকাতা, ১৯৭২। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, পৃ. ২২১। সতীদাহ ও ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিস্তারিত আলোচনার জন্য; ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি উৎসের সন্ধানে, শ্যামাপ্রসাদ বসু, কলকাতা, ১৯৮২। সামাজিক সংস্কারে রামমোহনের ভূমিকা। বেন্টিংকের কাছে মনে হয়েছিল, Slow and Limid বা 'শ্লথ এবং ভীরু'। দ্র. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক– দি মেকিং অব এ লিবারেল ইম্‌পিরিয়েলিস্ট, জন রোসেলি।

১৬. Sayyid Mahmud had become an addict to wine and had thereby lost the balance of mind. কে. এ. নিজামী; পৃ. ১৭১ (পাদটীকা) এবং পৃ. ১৫২-১৫৩।

নির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভেতর দিয়ে যে রেনেশাঁসের অভ্যুত্থান ঘটেছিল তা সরাসরি আঘাত করেছিল সামন্ততান্ত্রিক উপরিসৌধকে—অর্থাৎ পশ্চাৎপদ ধ্যান ধারণা, কুসংস্কার ও প্রচলিত অন্যায় ধারণাগুলিকে, কারণ সে সময়ে রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইউরোপে গড়ে উঠেছিল বণিক পুঁজিতন্ত্র। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা ছিলেন নানাভাবেই রাজ আশ্রিত। অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ ছত্রছায়ায় কিছুটা আর্থিক সুরাহা করে নেওয়া। ফলে এঁদের সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন সব সময়েই ইংরেজ সমর্থনের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতে তখন ব্রিটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশের যুগ। আর পুঁজির বিকাশে অন্তরায় ঘটায় কিছু কিছু সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা। সুতরাং সেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা সরাবার ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের স্বভাবতঃই থাকবে উদার আনুকূল্য। যা রামমোহন থেকে সৈয়দ আহমদ পর্যন্ত কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু যে মুহূর্তে সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার মূলে আঘাত করবে তখনই তার রূপান্তর ঘটবে উপনিবেশ বিরোধী এক গণআন্দোলনে। যা একমাত্র গড়ে উঠতে পারতো ধর্মকে ব্যক্তিগত আচরণের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে প্রকৃত যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়ে। কিন্তু উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন কৃষককে জমিদারের কাছ থেকে, শ্রমিককে মালিকের কাছ থেকে আর প্রজাকে রাজার কাছ থেকে মুক্ত করতে পারেনি, অন্ততঃপক্ষে মানসিক আনুগত্যের দিক থেকেও। তাই বিস্ময়ের কারণ ঘটে না যখন দেখা যায় সৈয়দ আহমদের সমুদয় সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টার উপসংহার ঘটছে 'পর্দা' প্রথার অনুমোদনের ভেতর দিয়ে। নিজামী লিখছেন, সৈয়দ আহমদ তাঁর আমলের মুসলমান পরিবারের পর্দারীতিকে অনুমোদন করেছিলেন।[১৭] যে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ সমর্থন, বাল্য বিবাহ বর্জন, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার ও পর্দাপ্রথা

---

১৭. He (i. e. Sayyid Ahmed Khan) was, however, not in favour of the Anglicising of Muslim girls and approved the Pardha observed in Muslims families of his day. কে. এ. নিজামী, পৃ. ৯৯। সামাজিক সংস্কারের ভিত্তি যে ধর্ম, সেই ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত আহমদকে পিছু হঠতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর সমর্থনে বলা হয়ে থাকে সমাজের রক্ষণশীল অভিজাতরা তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন এবং আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁদের সাহায্য লাভের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় যবনিকা টানেন। দ্র. মডার্ন ইন্ডিয়া; বিপান চন্দ্র; পৃ. ২২৩; দিল্লি, ১৯৭৭। মানবেন্দ্র রায়ের মতে সৈয়দ আহমদ খান আলিগড় কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার একটি আপস করেছিলেন। দ্র. ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিসন; এম. এন. রায়; পৃ. ২২১, বোম্বাই, ১৯৭১।

বর্জন এবং ১৮৭২ সালে ভারতীয় বিবাহ বিধি সরকারকে পাশ করাতে বাধ্য করে সেই কেশবচন্দ্র স্বয়ং ১৮৭৮ সালে নিজের নাবালিকা কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের হিন্দু মহারাজার বিবাহ দেন এবং পরবর্তীকালে স্ত্রী-জাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিরোধিতা করেন।

অবশ্য ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে উৎসাহদান বন্ধ করে দেয়। তাঁদের ধারণা ছিল সামাজিক রীতিনীতির উপর আঘাত পড়ার জন্যেই বিদ্রোহ ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী ভাইসরয় লিটন ১৮৭৬ সালে ঘোষণা করলেন, অতঃপর ভারতের সনাতন রীতিনীতিতে কোনোভাবে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। এ অবস্থায় নব্য উদারবাদী বুর্জোয়া সৈয়দ আহমদের সংস্কার প্রবৃত্তিতেও যে কিছুটা ভাঁটা দেখা দেবে তা আর বিচিত্র কী।

১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য বিশেষ করে বাংলার রৌপ্য ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ঐ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় দেখা দিলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অতীতের বণিক পুঁজিতন্ত্রের (Mercantile Capitalism) পরিবর্তে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা অবাধ বাণিজ্যিক পুঁজিতন্ত্রের (Free-trade Capitalism) নীতি গ্রহণে ঝুঁকে পড়লেন। আর এই নীতির সার্থক রূপায়ণে প্রয়োজন ভারতবর্ষকে খোলা বাজারে পরিণত করা। ১৭৮৫ সালে কোম্পানি গভর্নর জেনারেল হিসাবে কর্নওয়ালিশের প্রথম কাজ হলো কর্মচারীদের ব্যক্তিগত দুর্নীতি দমন করে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব বিধান করা এবং অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এক নতুন বশম্বদ জমিদার শ্রেণির ভেতর দিয়ে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। যাতে ব্রিটিশ পুঁজিপতির সামগ্রিক স্বার্থে ভারতবর্ষকে ধীরে ধীরে একটি নির্মম শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়। ফলে এদেশ তার প্রাচীন শিল্প (বিশেষ করে মশলা, সুতিবস্ত্র, সিল্ক বস্ত্র) গৌরব হারালো। ১৭৯০ সালে ইংল্যান্ডে ভারতীয় বস্ত্র আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। ইউরোপের চিনি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য ভারতীয় চিনির উপর চড়া শুল্ক ধার্য হলো। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে হস্তচালিক তাঁত শিল্পের ও তাঁতিদের সর্বনাশ হলেও পাল্টা জীবিকার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিল নব আবিষ্কৃত মেসিন। কিন্তু ভারতে হাজার হাজার তাঁতি ও কারিগরের পুরোনো বৃত্তি ধ্বংস হয়ে গেলেও ইংরেজরা গড়তে দিলো না নিজেদের স্বার্থে কোনো নতুন শিল্প কারখানা। যে ইংল্যান্ড অষ্টাদশ শতকের মাঝ

পর্যন্ত ছিল কৃষি প্রধান দেশ, সে উনিশ শতকের গোড়ায় পরিবর্তিত হয়ে গেল শিল্পোন্নত দেশে আর ভারতবর্ষের অবস্থা হলো ঠিক তার উল্টো। ১৮৪০ সালে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান পার্লামেন্টারি তদন্তের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ঢাকা শহর সম্পর্কে বলেন, যা একসময়ে ভারতবর্ষের ম্যানচেষ্টার বলে খ্যাত ছিল তা এখন দরিদ্র শহরে পরিণত হয়েছে।[১৮]

কিন্তু এ সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথম দিকে (অর্থাৎ প্রাক সিপাহি বিদ্রোহ আমলে) ভারতবর্ষের সামাজিক রক্ষণশীলতা ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীল ভূমিকাটিকে একেবারে তুচ্ছ করা যাবে না। মধ্যযুগীয় দৃষ্টিসম্পন্ন দেশীয় নৃপতিদের পরাজয়, সতীদাহ বিলোপ, দাসত্বপ্রথার আইনগত অবসান, ঠগীদমন, ধর্মের নামে সন্তান বিসর্জন বন্ধ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে ব্রিটিশরা যে এদেশের সনাতন সামাজিক ব্যবস্থার ভিতটিকে টলিয়ে দিয়েছিল একথা অনস্বীকার্য। এগুলি স্বাভাবিকভাবে এদেশীয় নব্য বুর্জোয়া শ্রেণির সংপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ সমাজ সংস্কারকেরা মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন— কীভাবে ইংরেজ শাসকেরা তাঁদের প্রচেষ্টায় স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শাসন ভারতের অচলায়তন সমাজকে ভেঙে দেওয়ার মুক্তিদূত হিসেবে দেখা দিয়েছিল। যা রামমোহনের ভাষায় 'সৌভাগ্য'—তাই তাকে উচ্ছেদ বা উৎখাত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

চার্লস ট্রেভেলিয়ানের মতে, ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরি করা, যারা নিজেদের স্থায়িত্বের স্বার্থেই স্বাভাবিকভাবে আমাদের আঁকড়ে থাকবে এবং ইউরোপীয় বিধি ব্যবস্থাগুলিকে আত্মস্থ করবে। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ভারতে ইংরেজ শাসনকে সাদর আহ্বান জানালেও সেইসাথে কীভাবে এদেশে একদিন ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটবে সে ব্যাপারেও তাঁর একটা ধারণা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যদি কখনো ইউরোপে উদারনীতি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, তাহলে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে ভারতেও তা যথাসময়ে আরম্ভ হবে এবং মুক্তির পথ প্রস্তুত হবে। রামমোহন পার্লামেন্টীয় আলোচনায় কেবল ধনবান অভিজাত গোষ্ঠী ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীগণের অংশগ্রহণের সমর্থক ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর এ দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রয়োজন—অর্থাৎ যে

১৮. ইন্ডিয়া টুডে; আর. পি. দত্ত; পৃ. ১২০; কলকাতা, ১৯৭০।

সময়ে ভারতবাসী ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র আয়ত্ব করতে পারবে।[১৯] স্যার সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-১৮১৮) রাজনৈতিক চিন্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কে. এ. নিজামী বলেছেন, সিপাহি বিদ্রোহোত্তর তিরিশ বছরের ভারতবর্ষের অবস্থা ও ভারতীয় চরিত্র ধীরভাবে পর্যালোচনা করে তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, পর্যাপ্ত শিক্ষালাভ না পাওয়া পর্যন্ত কোনোরূপ আইন প্রণয়নে বা প্রশাসনে অংশগ্রহণ নিছক আত্মপ্রতারণা হবে। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিপজ্জনক বলে বাতিল করেছিলেন এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হিসেবে শিক্ষার উপর যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ মনে করতেন একমাত্র শিক্ষার সাহায্যে হৃত রাজনৈতিক মর্যাদা এবং সমতা ফিরে পাওয়া সম্ভব। তাঁর মনে হয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের সময় এখনও আসেনি। বরং দেশের পক্ষে তা অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করবে। আইন সভায় সদস্য নির্বাচনের পরিবর্তে হয়তো এমন সাধারণ শ্রেণির মানুষ জয়ী হতে পারেন যিনি ভাইসরয়ের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে "আমার মাননীয় সহকর্মী" হিসেবে সম্বোধিত হওয়ার যোগ্য নন এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সাথে একই টেবিলে বসে আহারের জন্য যাঁকে অনুমতি দেওয়া যায় না। এমনকি তিনি যদি বি.এ. এম.এ. পাশও হন। সুতরাং কাউন্সিলে অভিজাত ব্যক্তিদের (রইস) মনোনয়নের জন্য সরকারকে দোষী করা যায় না।[২০]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাল্টা হিসেবে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার জন্য সৈয়দ আহমদ যে 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করেছিলেন মৌলানা তোফায়েল আহমদ তার পেছনে এম.এ.ও. কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়োডর বেকের অদৃশ্য হাত দেখেছিলেন। কে. এ. নিজামীও বলেছেন, যদিও কংগ্রেসের বিরোধিতা সৈয়দ আহমদের নিজস্ব তথাপি সেই সত্তর বছরের বৃদ্ধ মুসলমান নেতা বেকের উপর যে আস্থা রেখেছিলেন বেক তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।[২১]

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমে কিছুকাল সৈয়দ আহমদ কোনো সরাসরি মন্তব্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু ১৮৮৮ সালের ২৮

---

১৯. হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল থট; ১ম খণ্ড; বি. বি. মজুমদার; পৃ. ২২ এবং ৪২। রামমোহনস্ ওয়ার্কস; পৃ. ৪৪২।

২০. জওহরলাল নেহেরু, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫।

২১. কে. এ. নিজামী; ১৪৬-১৪৭

ডিসেম্বর তিনি তাঁর বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ বক্তৃতায় মুসলমানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার আহ্বান জানান, তাঁর মতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার দাবি ভারতীয় মুসলিমগণের স্বার্থবিরোধী। তিনি মনে করেন, মুসলমানদের এখন জ্ঞানলাভের দিকেই নজর দেওয়া উচিত। তাঁর ভাষায়, 'মুসলমান ভাইদের শিক্ষা চর্চার প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। আমি মনে করি শিক্ষার মধ্য দিয়েই হিন্দুস্তান, সরকার ও আমার জনগণের মঙ্গল ঘটবে।'

অথচ রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পুরো সত্য প্রকাশ করে না। কারণ এই বক্তৃতার মাত্র চার মাস আগে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের পাল্টা 'ইউনাইটেড পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন। এই গঠনের পেছনে বেকের সক্রিয় হাত ছিল। বেক একটি পত্রে লিখেছেন 'আমি তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছি এবং একটি অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছি।'[২২] বেকের উদ্দেশ্য ছিল অ্যাসোসিয়েশনকে দিয়ে ব্রিটিশের অনুকূল প্রচার এবং হিন্দু ও মুসলমানকে একে অপরের সন্নিকটে আসতে না দেওয়া। এ ব্যাপারে সৈয়দ আহমদের কতটা সাহায্য সত্যিকারে পেয়েছিলেন তা বলা শক্ত। কারণ অ্যাসোসিয়েশনের লিখিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী হিন্দু-মুসলমান নেতারা ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে তাঁদের ধারণা সম্মত দেশের সমস্যাবলি সম্পর্কে অবহিত করাবেন। দ্বিতীয়ত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে হিন্দুরাও ছিলেন। তবু একথা অনস্বীকার্য তাঁর মতো সর্বভারতীয় মুসলমান নেতা যদি কংগ্রেসে যোগদান করতেন তাহলে নিশ্চয় কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমানদের ভূমিকা আরও জোরদার হতো। বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং রহিমতুল্লা সায়ানীর মতো কংগ্রেসের সমর্থক মুসলমান নেতারা এ ব্যাপারে তাঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য, সৈয়দ আহমদের নিষেধ সত্ত্বেও ১৮৮৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে ১৮৮৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৫৮ জন মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে তাতে মুসলমান প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল মোট প্রতিনিধির প্রায় ৪২ শতাংশ (৩১১ অথবা ৩১৩) যাকে তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এক রেকর্ড বলা যেতে পারে।

জাতীয় কংগ্রেসে যোগ না দেওয়া, প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারি চাকুরি প্রার্থী নির্বাচনের বিরুদ্ধে অভিমত এবং প্রতিনিধিত্ব মূলক

২২. ঐ।

প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের অনুকূলে সৈয়দ আহমদ যে মতামত প্রকাশ করেন তার পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আধিপত্যের আশঙ্কা জাগরুক ছিল বলে অনেকে মনে করেন। মনে রাখা দরকার, তখনও পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে হিন্দুদের মধ্য থেকে গান্ধিজির মতো ধর্মের ক্ষেত্রে সার্বিক চিন্তার অধিকারী কোনো নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। ১৯০৯ সালে লর্ড মোরলের প্রস্তাবিত আইনে মুসলমানদের বিশেষ অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা থাকায় জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু গান্ধিজি এর উত্তরে 'ইন্ডিয়ান ওপিনয়ন' (৮. ১. ১৯১০) পত্রিকায় অভিমত ব্যক্ত করে লেখেন যে, এতে হিন্দুদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই—যেহেতু হিন্দু, মুসলমান একই পরিবারভুক্ত। মুসলমানরা যদি কিছু বেশিও পান, তাহলেও তা পরিবারের মধ্যেই থাকছে। কেবল পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তফাত ঘটছে। 'হিন্দুদের এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো হেতু নেই।'

গান্ধিজির পূর্বে হিন্দুদের তরফে এ ধরনের আশ্বাসদানের কোনো নেতা ছিলেন না। এটা স্বাভাবিক সৈয়দ আহমদের কাছে তাই প্রাথমিক প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষের জনসংখ্যার মোট এক-চতুর্থাংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থ দেখা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন নিষ্পিষ্ট না হয়। তবু এক্ষেত্রে তিনি শুধু মুসলমানদের কথা বলেননি। সমাজের অনুন্নত শ্রেণিগুলির কথাও বলেছিলেন। সমাজে লেখাপড়ায় অগ্রসর ভাষা গোষ্ঠীর আধিপত্যের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে যেহেতু বাঙালিরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে সেহেতু তারাই সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা একচেটিয়া করে নেবে। ফলে 'সাহসী রাজপুত, বলদৃপ্ত মারাঠি ও অন্যান্য সামরিক জাতি গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়বে।'[২৩]

---

২৩. ঐ; পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা যখন নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের দাবি জানাতে শুরু করল তখন কেন মুসলমানরা তাতে অংশ নিল না তার ব্যাখা এম. এন. রায় দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে হিন্দুদের প্রাধান্য ঘটবে এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। শুধু সাধারণ হিন্দুদের ক্ষেত্রে একথা সত্য নহে, শিক্ষিত সম্পত্তিশালী হিন্দুদের বেলাতেও একথা সত্য। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এ ধরনের আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন না। অবশ্য পরবর্তী সময়ে যখন দুইটি সম্প্রদায় তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করল এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুদের মতো উদার বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভবের জন্য সামাজিক ভিত্তি রচিত হলো তখনই কেবল পারস্পরিক অবিশ্বাসের পর্দাদি অপসৃত হয়েছিল। দ্র. এম. এন. রায়, পৃ. ২২০-২২১।

জওহরলাল নেহেরুর মতে হিন্দু বুর্জোয়ার নেতৃত্বে যে নতুন জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল তার প্রতি সৈয়দ আহমদের আকর্ষণ ছিল না। তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানরা যেন সর্বতোভাবে শিক্ষার দিকে নজর দেয় এবং রাজনীতি পরিহার করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুরা অর্ধশতাব্দীর মতো এগিয়ে, তাই তারা সরকারকে সমালোচনা করার মতো বিলাপ করতে পারে। কিন্তু সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সরকারের সাহায্যের উপর আস্থাশীল ছিলেন এবং কোনোরকম অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের দ্বারা সেই সাহায্য হারাবার ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। 'ঐতিহাসিক অথবা আদর্শগত দিক থেকে মুসলমানরা তখন পর্যন্ত বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কারণ হিন্দুদের মতো তখন তাদের মধ্যে থেকে বুর্জোয়াদের উৎপত্তি ঘটেনি। সে কারণে স্যার সৈয়দের কর্ম তৎপরতা যদিও দৃশ্যত নরমপন্থা তথাপি সঠিক বৈপ্লবিক দিকে পরিচালিত হয়েছিল।' যে সময়ে রাজনীতি থেকে তফাতে থাকার নীতি সৈয়দ আহমদ নিয়েছিলেন তাও নেহেরুর মতে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ছিল। তবে নেহেরু মনে করেছিলেন মুসলমানদের মতো প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি কখনও চূড়ান্ত আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি সৈয়দ আহমদ এক প্রজন্ম পরে জন্মাতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তাঁর বাণীতে নতুন তৎপরতা আরোপ করতেন।[২৪] যেমনটি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, যাঁর এক জীবনে দুই প্রজন্মের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। জীবন প্রত্যুষে যিনি একদা হিন্দুমেলায় হিন্দুর জয়গান গেয়েছিলেন, তিনিই জীবন সায়াহ্নে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের নিন্দা করে আন্তর্জাতিক মানসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাই বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ বাংলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের সপক্ষে পৃথক নির্বাচক গোষ্ঠীর স্মারকলিপিতে সাক্ষর দিলেও অথবা ১৯১১ সালে "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে "সবারে করি আহ্বান"—কেই বরণ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং স্যার সৈয়দ আহমদ সম্পর্কেও নেহেরুর আশাবাদকে নিতান্ত সৎ ইচ্ছা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসলে প্রশ্নটা হচ্ছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শঠতার আগুনে নিজের অভিজ্ঞতার মূল্যবোধকে বারবার যাচাই করে নেওয়ার যে শঠতা ও শোষণ রবীন্দ্রনাথের দেখার সুযোগ ঘটেছিল, তা সৈয়দ আহমদের ঘটেনি।

---

২৪. জওহরলাল নেহেরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩-৪৯৬।

সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে একটি তথাকথিত অভিযোগ, তিনি ছিলেন নাকি সাম্প্রদায়িক এবং ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়োডর বেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু মুসলমানদের পৃথক অধিকারের কথা বলেন। তোফায়েল আহমদ, অশোক মেহতা এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই ধারণার সপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন।

একথা ঠিক যে, সৈয়দ আহমদ তাঁর সারা জীবনব্যাপী কর্ম সাধনায় মুসলমানদের অভাব অধিকারের প্রশ্নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্ব-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যকে যখন তিনি জোরালোভাবে তুলে ধরতে গেছেন তখন তাঁকে স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাথে তুলনামূলক বিচারে নামতে হয়েছে। সৈয়দ আহমদের ধারণায় তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দু ও অনগ্রসর মুসলমানদের অধিকার কিছুতেই এক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন অধিকারের প্রশ্ন তখনই আসে যখন দুটি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অথনৈতিক অবস্থানের মধ্যে অভিন্নতা থাকে। উল্লেখ্য, যদিও সৈয়দ আহমদ তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের বক্তব্যকে প্রচার করেছিলেন তথাপি তাঁকে কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় না। তাঁর লেখা বা প্রচারে তিনি কদাপি হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃতিকে হীন প্রতিপন্ন করেননি। ১৮৭৩ সালের ২০ এপ্রিল জন মুরে কেনেডি সৈয়দ আহমদকে একটি পত্র দেন। তাতে তিনি বলেন, যদি আহমদ ইংল্যান্ড থেকে আলিগড় কলেজের জন্য চাঁদা সংগৃহীত করতে চান তাহলে তাঁকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রচারপত্র বিলি করতে হবে। যার বিষয়বস্তু হবে 'কীভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে সহমত হতে পারছে না।'[২৫] সৈয়দ আহমদ সেই প্রস্তাব তাঁর আদর্শের বিরোধী বলে তৎক্ষণাৎ বাতিল করেন। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে, এম.এ.ও. কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট ছাত্রটি ছিল হিন্দু।

১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন যখন কলেজটি পরিদর্শন করেন তখন লক্ষ্য করেন কলেজের মোট ছাত্রের প্রায় এক-চতুর্থাংশ হিন্দু। যদি কোনো হিন্দু ছাত্র বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় তাহলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে স্বর্ণপদক দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও সৈয়দ আহমদ ঘোষণা করেন। তিনি বললেন 'আমার মতে ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণতা শাস্ত্র বিরোধী।' আলিগড়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই কলেজের ছাত্ররা ভারতবর্ষের সর্বত্র সহনশীলতা ও খাঁটি নৈতিকতা প্রচার করবেন। এই

২৫. কে. এ. নিজামী, পৃ. ১৭০।

প্রসঙ্গে মৌলানা জামালুদ্দিন আফগানী প্রস্তাবিত 'প্যান ইসলামিক' আন্দোলনে সৈয়দ আহমদের অংশগ্রহণে অস্বীকৃতির ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। এটিকে শুধু ব্রিটিশ তোষণের উদাহরণ হিসেবে দেখলে এত বড়ো এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হবে না। সৈয়দ আহমদের নিখিল বিশ্ব মুসলমান আন্দোলনের প্রতি অনাস্থা ভবিষ্যতে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় চরিত্র ও সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মানসিকতা গঠনে সাহায্য করেছিল। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন নিজেদের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সত্ত্বা—যার সাথে তুরস্কের খলিফার কোনো সম্বন্ধ নেই, প্রভুত্ব প্রকাশের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পরবর্তীকালে অনেক সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতা ঘটনাক্রমে এই কলেজের পাশকরা ছাত্র ছিলেন বলে অনেকে সৈয়দ আহমদ এবং এম.এ.ও. কলেজকে সাম্প্রদায়িক আদর্শের জন্মদাতা বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু এই সমালোচনা যাঁরা করেন তাঁরা প্রধানত সাম্প্রদায়িকতাকে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, তাঁরা ভুলে যান সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি শিক্ষাগত কারণে ঘটে না, ঘটে সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে। অশিক্ষা বড়ো জোর সেই আগুনে কিছুটা ঘৃতাহুতির সঞ্চার করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মুসলমানদের মধ্যে এটি একটি অন্যতম পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হওয়ায় এখান থেকেই বেশি কৃতী ছাত্র পাশ করে বেরিয়েছেন। পরবর্তীকালে যদি এদের কেউ কেউ সাম্প্রাদায়িক রাজনীতি প্রচার করে থাকেন এবং সংখ্যায় যদি তাঁরা তুলনামূলকভাবে বেশিও হন তবে তার জন্য কলেজ নিশ্চয় দায়ী হতে পারে না। এই কলেজেরই এমন অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন যাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য সর্বতোভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। আলতাফ হুসেন হালী, জাকাউল্লাহ, মহম্মদ মুনামি প্রমুখেরা কখনই তাঁদের লেখনীকে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেননি। ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব তাঁর লেখা সুলতান মামুদের জীবনী গ্রন্থে হিন্দুর মন্দির লুণ্ঠনের জন্য তাঁকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। শিক্ষাতত্ত্বের মনোবিজ্ঞানীরা বলেন বাল্য ও যৌবনের শিক্ষাই শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রধান চালিকা শক্তির কাজ করে। আর সবথেকে কৌতুহলের বিষয় দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্যতম নায়ক মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ এই কলেজের পাশ করা ছাত্র ছিলেন না। একথা সত্য যে, এই কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষরা (থিয়োডার বেক,

মরিসন, আর্চিবল্ড) এবং অধ্যাপকরা নানা কৌশলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রচার করতেন। এ প্রচার সে সময়ে শুধু উক্ত কলেজের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—এটি ব্রিটিশরা সর্বভারতীয় নীতি ('Divideet impera' লর্ড এলফিনষ্টোন, গভর্নর অব বোম্বে মিনিট, ১৪ মে, ১৮৫৯) হিসেবে গ্রহণ করায় তাঁরা সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনযাত্রার সর্বত্রই এ ধরনের প্রচারেও লিপ্ত ছিলেন।

বহুধর্মের দ্বিধাবিভক্ত দেশে যদি বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই শুধু বলা হয়—অর্থাৎ সর্বশেষ বিশ্লেষণে তাঁদেরই অর্থনৈতিক সুবিধা ও অধিকারের দাবি জানানো হয় তাহলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট সেটা সাম্প্রদায়িক প্রতিভাত হওয়া খুব অযৌক্তিক নাও হতে পারে। তবে উনিশ শতকে হিন্দু লিবারেল বুর্জোয়া শ্রেণির নেতারা যে জাতীয়তাবাদ প্রচারের উদ্যোগী হয়েছিলেন তারও ভিত্তিটি ছিল প্রধানত ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস এবং আধুনিকতার চেয়ে ঐতিহ্যের। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) জাতীয়তাবাদকে একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে পরিণত করেন এবং শিকাগো শহরে মহাধর্ম সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। রামমোহন যেমন জাতির জাগরণের জন্য উপনিষদের বাণী গ্রহণ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভগবদগীতাকে ব্যবহার করেন। মহারাষ্ট্রে গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে প্রার্থনা সমাজের (১৮৬৭) সভ্যগণ তুকারাম, নামদেব, রামদাস প্রভৃতি ধর্মগুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একেশ্বরবাদকে গ্রহণ করে সামাজিক সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) ভারতবাসীকে হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন—'বেদ পড়ো এবং বেদের অনুশাসন অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করো।' সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির জন্য লোকমান্য তিলক (১৮৫৬-১৯২০) 'শিবাজী উৎসব', 'গণপতি' পূজা সারাদেশে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করার আহ্বান জানান। যিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে হিন্দু বীরত্বের প্রতীক।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা সব কিছুই হিন্দুধর্মের জারকরসে সিঞ্চিত হয়েছিল। তার সর্বশেষ পরিণতি ভাষার ক্ষেত্রে উর্দুর পরিবর্তে হিন্দির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার। কারণ হিন্দি সংস্কৃত মূলানুগ এবং এর লিপি দেবনাগরী। মৌলানা হালীর মতে ১৮৬৭ সালে বারানসীতে যে হিন্দি উর্দু বাদানুবাদ শুরু

হয়েছিল তা সৈয়দ আহমদের দৃষ্টিভঙ্গিকে একপেশে করার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগৎ যখন হিন্দু জাতীয়তাবাদের জয়গানে সোচ্চার ঠিক সেই সময়ে মুসলমান সমাজে স্যার সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব, শতাব্দীর জড়তা, সংকীর্ণতা, পশ্চাৎপদতা থেকে তিনি তাঁদের মুক্ত করতে এসেছিলেন। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষা হলেও তা ছিল ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্মত। তাই হিন্দু নেতাদের মতো তাঁরও সাফল্য আংশিক। ভারতের নবোত্থিত বুর্জোয়া সমাজ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনকে ছিন্ন করার কোনো চেষ্টা করেনি। তাদের সংস্কার প্রচেষ্টাও সে কারণে ছিল সামন্ততান্ত্রিক আপসের নামান্তর, ঐতিহাসিক নিয়মে সে কাজ একমাত্র সিদ্ধ হতে পারে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি।

ভারতে ব্রিটিশ শিল্প পুঁজি তখনও ফিনান্স পুঁজিতে পরিণত না হওয়ায় তার শানিত নখদন্ত সম্বলিত বিকট মূর্তি উদারবাদী বুর্জোয়াদের চোখে প্রতিভাত হয়নি। তাঁরা দেখেছিলেন কেবল তার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্বেতশুভ্র সরস্বতীর রূপটিকে। বসিয়েছিলেন তাকে মধ্যযুগের পবিত্রতার আসনে। তাই জাতীয় কংগ্রেসের দাবিদাওয়া নরমপন্থিদের নেতৃত্বে প্রার্থনা, প্রতিবাদ ও পিটিশনের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৮৫ সালে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইংরেজ প্রশাসক এ. ও. হিউম এবং প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন ব্রিটিশ ভাইসরয় মার্কুইস অব ডাফরিন। ১৮৮৬ সালে লর্ড ডাফরিন এক বক্তৃতায় বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কংগ্রেসের মাধ্যমে শিক্ষিত অনুগত শ্রেণির সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থনের ভিত্তিকে প্রস্তুত করা। উল্লেখ্য, সৈয়দ আহমদকে জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ১৮৮৭ সালের ৩ মার্চ এ. ও. হিউম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তবে সে সাক্ষাৎকার ফলপ্রসু হয়নি। ১৮৯৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে সৈয়দ আহমদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাজী মহম্মদ ইসমাইল খান একটি প্রস্তাব রাখেন। তাতে তিনি বলেন, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ডিস্ট্রিকট বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে হিন্দু ও মুসলমানদের তরফে যেন সম সংখ্যক সদস্য নেওয়া হয়—এই মর্মে যেন কংগ্রেস একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেস সে প্রস্তাব বাতিল করে। তবে সৈয়দ আহমদ এক প্রবন্ধে ইসমাইলের প্রস্তাব শুধু

সমর্থন করেননি, উপরন্তু বলেন এটি গ্রহণ করলে মুসলমানরা কংগ্রেসে যোগ দেবে।[২৬]

২৬. ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস; পি. সি. ঘোষ; পৃ. ১৫১-১৫২; উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য। হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম ম্যুভমেন্ট; রমেশচন্দ্র মজুমদার; ১ম খণ্ড; পৃ. ৪৩২। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা যদি কংগ্রেসের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকেন, তার কারণ কংগ্রেসের 'বিদ্রোহী' চরিত্র নয়। এর কারণ, কংগ্রেস যে ঝোঁকের প্রতিনিধিত্ব করে তা ছিল তাঁদের বাঞ্ছিত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ট্রাডিশনের পরিপন্থি। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁদের সমর্থন এবং সহানুভূতি নগণ্য কিছু সুবিধা দিয়ে কেনা যায়নি– যেটা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যদিকে এর উৎপত্তি ঘটেছিল এই বিশ্বাস থেকে যে, ব্রিটিশ শাসন তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করবে– যা তারা আশঙ্কা করছিলেন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে যদি হিন্দু উদারবাদীদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। রায়ের মতে এ আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল গোঁড়া জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে, যার চরিত্র ছিল হিন্দু সংকীর্ণতা এবং স্বভাবতই সে কারণে তাই আশা করা যায় না যে মুসলমানরা ঐটিকে সদয়ভাবে দেখবেন। দ্র. এম. এন. রায়; পৃ. ২২২-২২৩।

খিলাফত আন্দোলন

'খিলাফত' কথাটির অর্থ উত্তরাধিকারী। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.) ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধান। পয়গম্বরের কোনো উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তবে পরবর্তীকালে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধানের উত্তরাধিকারী নির্বাচন হতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

অষ্টাদশ শতক থেকে তুরস্কের সুলতানকে সারা মুসলিম জগৎ 'খলিফা' বা ধর্মগুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাই তুরস্কের সুলতানের এক স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ আসন ছিল।

১৯১২-১৩ সালে বলকান যুদ্ধের সময়ে ইংল্যান্ডের তুরস্ক-বিরোধী মনোভাব ও সবশেষে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষে তুরস্কের যোগদান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানগণকে ক্রমশ ব্রিটিশ-বিরোধী করে তুলেছিল।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ প্রসঙ্গে রম্যাঁ রল্যাঁ বলেছেন, ভারতীয় মুসলমানরা বিবেকের একটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ইংল্যান্ড যখন প্রতিশ্রুতি দিলো যে সুলতান বা খলিফার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে তখনই তাঁরা সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের রায় দিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সমাপ্তির পর ইংল্যান্ড যখন কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য দিলো না তখনই শুরু হলো খিলাফত আন্দোলন, যা রল্যাঁর ভাষায় খিলাফত বিদ্রোহ।

প্রকৃতপক্ষে ১৯১৯ সালের শান্তি চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক তার এশীয়-অঞ্চল থেকেও বঞ্চিত হলো। 'ম্যান্ডেট' বা অছির আড়ালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সেগুলোও গ্রাস করল। খোদ তুরস্কের মধ্যেই সুলতানের শাসনক্ষমতা খর্ব করা হলো। ক্ষমতার প্রধান উৎস হলেন মিত্রপক্ষের নিযুক্ত হাই কমিশন।

স্বভাবতঃই ভারতীয় মুসলমানরা একে ব্রিটেনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করলেন এবং তীব্র ঘৃণা ও বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এই নীতি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনে তাঁরা ব্রিটেনের উপর শক্তি প্রয়োগেও স্থির নিশ্চিত হলেন। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাগত 'সত্যাগ্রহে'র নায়ক গান্ধিজি— যিনি কিছুকাল থেকেই তাঁর লেখায় মুসলমানদের তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিকে মুক্তকণ্ঠে সমর্থন জানিয়ে আসছিলেন[২৭]—তিনি এবার এগিয়ে এলেন 'সত্যাগ্রহে'র অস্ত্র নিয়ে তাঁদের সাহায্যে। এইভাবে শুরু হলো খিলাফত আন্দোলন।

১৯১৯ সালের ২৩ নভেম্বর দিল্লিতে যে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো তাতে গান্ধিজি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হলো যদি মুসলমানদের পক্ষে সন্তোষজনক ভাবে তুরস্কের প্রশ্ন মীমাংসা করতে ব্রিটেন ব্যর্থ হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বয়কট এবং অসহযোগিতার অস্ত্রও প্রয়োগ করা হতে পারে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাল।

ইতিমধ্যে মুসলমান বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে যে সব চরমপন্থিরা কারারুদ্ধ ছিলেন তাঁরা একে একে যুদ্ধশেষে মুক্তি লাভ করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য আলী ভ্রাতৃদ্বয়— মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী। কিছুদিন পরে ১৯২০ সালের গোড়ায় 'আল-হিলাল' পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আবুল কালাম আজাদও মুক্তিলাভ করেন।

যাই হোক, ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে কংগ্রেসের মাধ্যমে চরমপন্থি হিন্দু বুর্জোয়া নেতারা ও খিলাফতপন্থিরা গান্ধিজির নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলনকে আরও দুর্বার করতে মনস্থির করলেন।

ঠিক হলো হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের একত্রে গঠিত একটি ডেপুটেশন ভাইসরয়ের কাছে গিয়ে মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতিকার চাইবেন। এই সম্পর্কে দেওয়া দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন গান্ধিজি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মোতিলাল নেহেরু, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গ। অন্যান্যের সাথে দাবিপত্রে খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ডেপুটেশন ভাইসরয়ের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করতে ব্যর্থ হলো। ফলে খিলাফতপন্থিরা

২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার; হিষ্ট্রি অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া; তৃতীয় খণ্ড; পৃ. ৫৫; কলিকাতা, ১৯৬৩।

মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সাথে দেখা করার জন্য ইংল্যান্ড পাড়ি দিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁরা ব্যর্থ মনোরথ হলেন। লয়েড জর্জ পরিষ্কার জানালেন, অন্যান্য পরাজিত জাতির মতোই তুরস্কের সাথে ব্যবহার করা হবে।

ওদিকে সৌকত আলী এক ফতোয়ায় ঘোষণা করলেন যে, আগত সন্ধিশর্তে খিলাফতের সম্মান রক্ষিত না হলে ইংরেজের সাথে সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ১০ মার্চ, ১৯২০ সালে গান্ধিজি খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পথকে অবাস্তব বলে বাতিল করলেন। তার বদলে অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য নিরস্ত্র বা অহিংস আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দিলেন। আন্দোলন অবশ্যই অসহযোগিতার পথ ধরে চলবে। তাঁর ভাষায়—

> মুসলমানরা যে অধিকারগুলিকে জীবন-মৃত্যুর মতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন সেগুলিকে পদদলিত করার পর ইংল্যান্ড কিছুতেই আর আমাদের নিকট ভীরু আনুগত্যের আশা করতে পারে না।

গান্ধিজি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে সর্বাগ্রে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন—

> বিপদের দিনেই বন্ধুত্বের মহৎ পরীক্ষা। হিন্দু, পার্শি, খ্রিষ্টান অথবা ইহুদি আমার যাই হই না কেন, যদি এক জাতি হিসেবে আমরা বেঁচে থাকার ইচ্ছা করি তাহলে একের স্বার্থকে সবার স্বার্থ হিসাবে জ্ঞান করতে হবে। ...আমরা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বলি কিন্তু তা ফাঁকা থেকে যাবে যদি মুসলমানের বিপন্ন স্বার্থ থেকে হিন্দুরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখে।

আন্দোলনের দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য খিলাফত কমিটি গান্ধিজি, সৌকত আলী এবং আজাদকে নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করল। কমিটি শান্তি-চুক্তির শর্তগুলো প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন শুরু না করতে সুপারিশ করে।

১৪ মে ভারত সরকারের বিশেষ গেজেট মারফত ভারতবাসী জানতে পারল তুরস্কের প্রতি মিত্রপক্ষের অবিচারের শর্তগুলো। আর ঠিক একই সঙ্গে প্রকাশিত হলো পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে হান্টার কমিশনের রায়।

১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইন' বা মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারাবলি ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দাবিগুলিকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল আবার একই সাথে ব্রিটিশ সরকার বিনা বিচারে বন্দি করার মতলবে

কুখ্যাত 'রাওলাট আইন' চালু করে জনগণকে আরো বিক্ষুব্ধ করে তুলল। এই আইন অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে দেশের সর্বত্র গড়ে উঠল ব্যাপক আন্দোলন—যার ঢেউ সবচেয়ে বেশি দেখা গেল পাঞ্জাবে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করে নিরস্ত্র নিরীহ জনগণের উপর ঘটল নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। শুধু তাই নয়, বিমান থেকেও বোমা বর্ষণ করে পাঞ্জাবের অগণিত মানুষকে হত্যা করা হলো। প্রথমে এসব ঘটনা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপা থাকল না—সব প্রকাশ পেল। তখন ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে স্যার জন হাণ্টারকে সভাপতি করে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করলেন। কমিটি তাঁদের রিপোর্টে সংখ্যাধিক্য সদস্যদের সমর্থনে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে লঘু করে দেখিয়ে সমস্ত ঘটনার জন্য পাঞ্জাবের আন্দোলনকেই দায়ী করলেন। নারকীয় হত্যার নায়ক ডায়ারকেও আবার স্বদেশে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা হলো।

বলাবাহুল্য কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের সাথে সাথে সারা দেশ জুড়ে এক তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করল। গান্ধিজি এই অসন্তোষের পুরো সুযোগ গ্রহণ করলেন। খিলাফত আন্দোলন ও জনগণের বিক্ষোভকে একই খাতে বহালেন।

২৮ মে সারা ভারত খিলাফত কমিটি বোম্বাইতে তাঁদের সভায় গান্ধিজি প্রস্তাবিত অসহযোগিতার কর্মসূচি মুসলমানদের সামনে একমাত্র বাঁচার পথ বলে ঘোষণা করলেন। এর দু-দিন পরে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বেনারসে বসলো। পাঞ্জাবের অত্যাচার ও ভারত শাসন বিধির ত্রুটিগুলির সাথে খিলাফতের দাবি এবার যুক্ত হলো। বলা হলো অনতিবিলম্বে দেশবাসীর সামনে অসহযোগের কর্মসূচি তুলে ধরা হোক।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিধর্মী শাসিত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে প্রতিবেশী মুসলমান রাজ্য আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পয়গম্বরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একে তাঁর বললেন হিজরত। অনেকে আফগান রাজ্যে পৌঁছালেন, কেউ কেউ এমনকি সোবিয়েত ইউনিয়নে আর বহু ব্যক্তি পথশ্রমে পথেই মারা গেলেন। কাবুলে গফফর খাঁয়ের সাথে রাজা আমানুল্লার এ বিষয়ে আলোচনা হলো। এ ধরণের বিদেশ যাত্রাকে নিরুৎসাহ করার ব্যাপারে দু-জনে একমত হলেন। গফফর খাঁ দেশে ফিরে এলেন। কেবল জুলাই মাসে প্রায় আঠারো হাজার মুসলমান হিজরত করলেন কিন্তু আফগান কর্তৃপক্ষের নিকট

তাঁরা সক্রিয়ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। ভারতীয় মুসলমানরা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা স্বদেশ ভূমির প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করলেন। এবার আন্দোলনের চাপ সরাসরি ব্রিটিশদের উপর এসে পড়ল।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে গান্ধিজি প্রদত্ত অহিংস অসহযোগিতার কর্মসূচি গৃহীত হইল। এই আন্দোলন অন্যায়ের প্রতিকার ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। আন্দোলনের তিনটি স্তর সূচিত হলো। প্রথম স্তর : আইনসভা, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন বা বয়কট। দ্বিতীয় স্তর : প্রতিটি গৃহে চরখায় সূতা কাটার ব্যবস্থা এবং তৃতীয় স্তর আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে শুরু হবে সম্পূর্ণরূপে কর বর্জন বা নো-ট্যাক্স নীতি। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে দুটি প্রধান প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরা হলো—একটি খিলাফত ও দ্বিতীয়টি পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত নৃশংস অত্যাচার।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মতো যে সব প্রবীণ নেতারা অসহযোগ আন্দোলনের অনুকূলে ছিলেন না গান্ধিজি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, এ রকম কাজ হবে মুসলমান ভাইদের প্রতি মিথ্যাচারণ।[২৮] আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিংসার ঝুঁকি নিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর কথায়, 'একটি জাতিকে হীনবীর্য করার ঝুঁকির চেয়ে আমি হাজার হিংসার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত'।[২৯] 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ১১ আগস্ট লিখিত প্রবন্ধে তিনি যদিও অহিংসাকে হিংসার বহুগুণ উপরে শক্তিশালীরূপে স্থান দিলেন তবু একথাও জানাতে ভুললেন না যে, ভীরুতা ও হিংসার মধ্যে তিনি হিংসাকেই বেশি মূল্য দেন। তাঁর ভাষায় : 'নিজের অমর্যাদার প্রতি অসহায় সাক্ষী হয়ে থাকার চেয়ে আমি চাইব ভারতবর্ষ বরং তার মর্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্রের প্রয়োগ করুক।'[৩০] অবশ্য তিনি ওই একই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ যে অসহায় নয় সে কথাও জানাতে ভুললেন না। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি তাৎপর্যজনক নীরব রইলেন, সেটি হচ্ছে আন্দোলনের এক বিশেষ স্তরে প্রতিপক্ষের সশস্ত্র হামলার মুখে যদি জনগণ নিজেকে অসহায় বোধ করেন তখন তাঁরা কী করবেন?

মুসলিম লীগ ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ

২৮. ডি. জি. তেণ্ডুলকর; মহাত্মা; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩; ভারত সরকার, ১৯৬১ (১ম-৩য় খণ্ড)।

২৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৪।

৩০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা- ৫।

আন্দোলনের পথ বেছে নিল— যদিও পুরোপুরি গান্ধিজির কর্মসূচি নয়। বোঝা গেল অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্র ক্রমশ বিশাল ও ব্যাপক হতে চলেছে। কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধিজি বলেছিলেন, যদি দেশবাসী তাঁর অনুসৃত পথে চলেন তাহলে তিনি এক বছরের মধ্যে 'স্বরাজ' এনে দেবেন। তাঁর মতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই কেবল খিলাফতের অন্যায় দূর হতে পারে। অন্য কোনো ভাবে নয়। তাঁর কথায় 'আমি খুশি মনে স্বরাজের আন্দোলন বন্ধ করে দেব যদি তার দ্বারা খিলাফতের স্বার্থকে অগ্রসর করা যায়... কিন্তু আমার বিনীত ধারণায় স্বরাজ অর্জনই কেবল দ্রুত খিলাফতের অন্যায় দূর করতে পারে।'[৩১]

শুরু থেকেই অসহযোগ আন্দোলন অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করল। ভারত শাসনবিধির ভিত্তিতে নভেম্বর মাসে নতুন আইনসভা সমূহে যে নির্বাচন হলো তা সাফল্যের সাথে বয়কট করা হলো। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ও আইনজীবীরা ব্রিটিশের আদালত বর্জন করলেন। আন্দোলন ক্রমশ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ল। স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও জনসভাসমূহ নিষিদ্ধ হলো। গান্ধিজি ব্যতীত দেশের প্রায় সমস্ত শীর্ষস্থানীয় নেতা ও অসংখ্য কর্মী কারারুদ্ধ হলেন। সরকার দিশেহারা হয়ে ক্রমশ মারমুখী হয়ে পড়ল। ফলে দেশবাসীর পক্ষেও সব সময়ে অহিংসাকে আন্তরিকভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা সম্ভব হলো না। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে তেজোদৃপ্ত ভাবটা ক্রমশ বেশি করে ফুটে উঠতে লাগল। ১৯২১ সালের মধ্যে কমপক্ষে চারশো শ্রমিক ধর্মঘট হলো। মেদিনীপুরে শুরু হলো কর-বন্ধ আন্দোলন—গান্ধিজির বিনানুমতিতে। দক্ষিণ ভারতে ও মালাবারে ঘটল মোপলা বিদ্রোহ। পাঞ্জাবে ধনী-মোহান্ত শাসিত ও সরকার সমর্থিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পবিত্র করে তোলার জন্যও শুরু হলো আকালি আন্দোলন।

ইংল্যান্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারত আগমন 'অভিনন্দিত' হলো সারা ভারত-বন্ধের ভেতর দিয়ে। ওই বছরের মাঝামাঝি পাঁচশো জ্ঞানী মুসলমান উলামা এক ফতোয়া জারি করে মুসলমানদের পক্ষে অমুসলমান অর্থাৎ ব্রিটিশের অধীনে চাকুরি করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত করাচির খিলাফত কনফারেন্সে আলী ভ্রাতৃদ্বয় শুধু যে উক্ত ফতোয়াকে জোর প্রচার দিলেন তাই নয় সেই সাথে মুসলমান সৈনিকদের আহ্বান জানালেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী বর্জন করতে। মহম্মদ আলী দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যদি খ্রিষ্টমাসের মধ্যে উপযুক্ত মীমাংসা না হয় তাহলে কংগ্রেসের আগামী আমেদাবাদ অধিবেশনেই

৩১. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৯৬।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হবে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের এ ধরণের বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা ও কার্যাবলির জন্য তাঁদের এবং আরো চারজন মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদোহীতার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো। বিচারে ১ নভেম্বর তাদের দু-বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হলো। গান্ধিজি আলীভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তৃতাগুলিকে সমর্থন জানালেও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে যে বক্তব্য বেরোল তার শিরোনাম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—'ধীরে চলো'! দেশে গড়ে উঠল কংগ্রেস ও খিলাফতের মিলিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যা শাসকশ্রেণিকে আরো আতঙ্কগ্রস্ত করল। ঠিক এই সময়ে ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস অধিবেশন বসল, যে অধিবেশনের দিকে শুধু খিলাফতপন্থিরা নয়, সমগ্র দেশবাসী বলদৃপ্ত নেতৃত্বের জন্য আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু আমেদাবাদে দেখা গেল গান্ধিজি 'ধীরে চলো' নীতিকেই রূপ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রিপাবলিকান মুসলমান নেতা হসরত মোহানী যখন 'স্বরাজ'কে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি বলে ঘোষণা করলেন তখন গান্ধিজি করলেন তার প্রতিবাদ। কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে বড়োলাট ভারত-সচিবের কাছে এক তারবার্তায় সানন্দে জানালেন খিলাফত দলের এক অংশ অহিংসার পথ ত্যাগ করার যে প্রস্তাব দিয়েছিল গান্ধিজি তা অগ্রাহ্য করেছেন।[৩২] এমনকি কংগ্রেস তাদের প্রস্তাবে বহু বিজ্ঞাপিত ট্যাক্স-বন্ধেরও কোনো উল্লেখ করেননি।

কিন্তু দেশবাসী বিপ্লবের উত্তেজনায় উদ্বেলিত। কর বন্ধের প্রস্তাব না থাকলেও গান্ধিজিকে শেষ পর্যন্ত তা জনগণের চাপে মেনে নিতে হলো। কারণ কংগ্রেসের তোয়াক্কা না করেই মেদিনীপুর, গুন্টুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণ স্বয়ং কর-বন্ধের আন্দোলন শুরু করে দিলো। গান্ধিজি এটা অনুমোদন করলেন না। গুন্টুর জেলার লোকেদের আইনমাফিক ট্যাক্স মিটিয়ে দিতে বলা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ট্যাক্স-বন্ধের বদলে গান্ধিজি স্থির করলেন একমাত্র বারদৌলী জেলাতে তাঁর নেতৃত্বে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন হবে। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ওই সময়ে বারদৌলীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাতাশী হাজার।

যাই হোক, বারদৌলীর সত্যাগ্রহও শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হলো। যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে অত্যাচারের প্রতিশোধে আকুল জনসাধারণ পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নিসংযোগ করল এবং প্রায় বাইশ জন পুলিশ মারা পড়ল। এই সংবাদ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজি অনুভব করলেন হিংসার

৩২. মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৫২।

বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশের সর্বত্র হাজার হাজার চৌরিচৌরা সংগঠিত হবে। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ তাড়াহুড়ো করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডেকে 'চৌরিচৌরায় জনতার অমানুষিক কার্যাবলি'র তীব্র নিন্দা করা হলো এবং গান্ধিজি ঘোষণা করলেন, আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধের। তাঁর মতে দেশবাসী এখনও অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়। রজনী পাম দত্তের ভাষায়— 'যুদ্ধ শেষ। সমগ্র অভিযানও শেষ হয়ে গেল। পর্বত বাস্তবে মুষিক প্রসব করল।'

১০ মার্চ গান্ধিজি গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে ছ-বছরের কারাদণ্ড হলো। গান্ধিজির আচরণে হতবাক দেশবাসী তাঁর এত বড়ো সাজার বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ করল না। স্বরাজ ও খিলাফত দু'য়ের ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রাপ্তির ঘরে বিরাট শূন্য।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, মুসলমান নেতারা প্যান-ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে খিলাফতের মতো এক অতিরাষ্ট্রিক আনুগত্যের স্লোগানকে ঊর্ধ্বে তুলে ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তিকেই হাসিল করতে চেয়েছিলেন ('to make the Muslims a great political power in India')। হিন্দু নেতারা যাঁদের মধ্যে গান্ধিজি ছিলেন অগ্রগণ্য এই তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে ফাঁদে পড়ে গেলেন (The Hindu leaders fell into the trap')[৩৩]। খিলাফত আন্দোলনের এই ব্যাখ্যা সুস্পষ্টই অতি সরলীকরণ। তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের অন্যায় আচরণ কেবল ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রেই ক্ষোভের কারণ ঘটায়নি, হিন্দু নেতাদের মধ্যেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহুপূর্ব থেকে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'তে নেহেরু তার উল্লেখ করেছেন।[৩৪] ১৯২০ সালের ২২ জুন ভাইসরয়কে লেখা চিঠিতে গান্ধিজি জানান কীভাবে লন্ডনে থাকাকালীন খিলাফত সমস্যা তাঁকে চিন্তিত করেছিল এবং ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষে ফিরে তাঁর প্রথম কাজ ছিল মুসলমানদের মধ্যে এই সমস্যার গভীরতা পরীক্ষা করা।[৩৫] মুসলমানরা যদি নিজেদের রাজনৈতিক শক্তির প্রমাণ দেখাতেই আগ্রহী থাকতেন তাহলে তাঁরা আন্দোলনের নেতৃত্ব একজন হিন্দু নেতা অর্থাৎ গান্ধিজির হাতে ছেড়ে দিতেন না। নেহেরুর মতে ইসলামের পুরোনো গৌরব ভারতীয় মুসলমানদের মনে

---

৩৩. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৬২-৬৩।

৩৪. জওহরলাল নেহেরু; ভারত সন্ধানে (বাংলা অনুবাদ); পৃ. ৩৮৪; কলিকাতা, ১৩৫৬।

৩৫. মহাত্মা; প্রথম খণ্ড; পৃ. ২৯৫; ভারত সরকার, ১৯৬০।

একটা আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি করেছিল আর সেই গৌরব নিয়ে তখন একমাত্র তুরস্কই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে টিকে ছিল। 'ভারতীয় মুসলমানদের এই আত্মপ্রসাদ তাঁদের জাতীয়ভাবের পরিপন্থি ছিল না।'[৩৬]

খিলাফত আন্দোলনের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে পেছনের কয়েক বছরের জনসাধারণের ব্রিটিশ বিরোধী ক্রমশ অসন্তোষ এবং তার প্রকাশ বিভিন্ন সংগ্রামী বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত অসন্তোষ ও অশান্তির মূল হেতু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। যে শোষণের জাঁতাকলে মুসলমানরাও নিষ্পেষিত হয়েছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোবিয়েত ইউনিয়নে যে বিপ্লব ঘটল তা শুধু সে দেশের পুঁজিতন্ত্রকে অবসান ঘটালো তাই নয় তার প্রভাব অন্যান্য নির্যাতিত দেশের মতো ভারতবর্ষেও অনুভূত হলো। ১৯১৮-এর শেষ থেকে ১৯১৯-এর গোড়া পর্যন্ত ভারতে এক অভূতপূর্ব শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা গেল। ১৯১৮'র ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই মিলে ধর্মঘট শুরু হলো। জানুয়ারিতে সে ধর্মঘটে প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার শ্রমিক সামিল হলো। যুদ্ধের সময়েই সৈন্যবাহিনীতে কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ অবসানে অর্থনৈতিক অবস্থা আরো দুঃসহ হয়ে পড়লো। ফলে বিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে উঠল। কংগ্রেসের সভাপতি লালা লাজপত রায়ের ভাষায়— 'এ সত্যকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে, আমরা এক বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছি।'

১৯১৯ সালের কুখ্যাত 'রাওলাট আইন' প্রণয়নই ব্রিটিশ কর্তৃক এই বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ের পরোক্ষ স্বীকৃতি। কিন্তু ইংরেজের এই দমনমূলক আইনও জনগণকে দমাতে পারেনি। আর এই জনগণের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও মুসলমানরাও হিন্দুদের মতোই একটি অংশ ছিল। নেহেরুর মতে কিছু কিছু মুসলমান তরুণও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৩৭] আলিগড় কলেজ অবশ্য চেষ্টা করছিল যাতে এই মনোভাব মাথাচাড়া না দিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'খিলাফতে'র মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য আলিগড় আন্দোলনের উদ্‌গাতা স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের তুরস্ক সম্পর্কে নিবৃত্ত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে, তুরস্ক-প্রেম আখেরে ব্রিটিশ বিরোধিতায় পর্যবসিত হবে।

খিলাফত ও পাঞ্জাবের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে স্বরাজের প্রশ্নটি তুলে ধরার ফলে হিন্দু

৩৬. ভারত-সন্ধানে; পৃ. ৩৮৪

৩৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯৭

ও মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণির ঐক্যের পথটি সুগম হয়েছিল। অবশ্য 'স্বরাজের' দাবিটি গান্ধিজির নিজস্ব ভাবনায় ছিল না। গান্ধিজি এটি গ্রহণ করেছিলেন কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২০) প্রস্তাবের সংশোধনী আকারে। গান্ধিজি নিজে বলেছেন, এই সংশোধনী তিনি তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু চৌধুরী খালিকুজ্জামান যিনি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন তিনি অবশ্য লিখেছেন যে, অনিচ্ছুক গান্ধিজি মৌলানা সৌকত আলীর একান্ত আবেদনে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। সে যাই হোক, তৎকালীন দেশের অর্থনৈতিক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াদের এই ঐক্য নিজেদের স্বার্থেই ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন কৃষিনির্ভর ভারতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ কৃষকদের গলায় ক্রমশ ফাঁস হয়ে চেপে বসেছিল আর সদ্য প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানার সংঘবদ্ধহীন শ্রমিকদের অবস্থাও খুবই দুঃসহজনক হয়ে উঠেছিল, যা নেহেরুর ভাষায় 'যাদের কথা কেউ ভাবত না— না রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ, না সরকার বাহাদুর।'[৩৮] উল্লেখ্য, দু-বছরব্যাপী এই আন্দোলনে গান্ধিজি থেকে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় পর্যন্ত কারুর কণ্ঠে কৃষক বা শ্রমিকের সমস্যা প্রধান রূপে দেখা দেয় নাই। ফলে আন্দোলনের শ্রেণি চরিত্রটি খুবই পরিষ্কার ছিল। গান্ধিজি শুধু বলেছেন স্বরাজের লক্ষ্য খিলাফত ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার। অতিরিক্ত কিছু নয়।[৩৯]

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে গান্ধিজির ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছিল ১৯১৮ সালে জুলাই মাসে আর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবের উপর অত্যাচার ঘটল ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে। ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। যদিও তৎক্ষণাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না, তবে পাঞ্জাবের অমানুষিক ঘটনাবলি নিয়ে জোর বিতর্ক হলো। আর ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৯ সালের 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যায় গান্ধিজি সুপারিশ করলেন ইংরেজ প্রদত্ত সংস্কারাবলি গ্রহণ করতে। তিনি লিখলেন যে, নিশ্চিত এর দ্বারা ভারতের প্রতি ব্রিটিশ

---

৩৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮৭। খালিকুজ্জামানের বক্তব্য; উদ্ধৃতির জন্য; মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৮২৬।

৩৯. "স্বরাজ" এর দাবি জানিয়ে কলকাতা কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর, ১৯২০) গান্ধিজি যে প্রস্তাব পেশ করেন তার তৃতীয় অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'It conveys the definite idea that Swaraj was demanded only to redress Punjab and Khilafat worngs and thereby vindicate national honour and prevent their repetition in future.' মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৯৫। জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন, 'আমাদের অধিকাংশ নেতা স্বরাজ বলিতে স্বাধীনতা অপেক্ষা অনেক কম বুঝিতেন। গান্ধিজি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিতেন এবং এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না।' জওহরলাল নেহেরু; আত্মচরিত (বাংলা অনুবাদ); পৃ. ৮১, কলকাতা, ১৩৫৫।

জনগণের সুবিচার করার সদিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই প্রবন্ধ লেখার পাঁচ মাসের মধ্যে দেখা গেল গান্ধিজি ব্রিটিশ সুবিচারের উপর আস্থা হারিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। পাঞ্জাবের অত্যাচারকে আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার করেছেন। হাণ্টার কমিশনের সংখ্যাধিক্য রিপোর্ট—যা এসময়ে প্রকাশ হয়েছিল—তা নিশ্চয় গান্ধিজি বা কংগ্রেসের কাছে অবাক কোনো সংবাদ বয়ে আনেনি। একমাত্র মূঢ় ছাড়া কে আশা করতে পারে যে, অনিচ্ছুক সরকার নিযুক্ত কমিটি পাঞ্জাবে তার সংগঠিত অত্যাচারের আত্মস্বীকৃতি দেবে? আসলে তৎকালীন বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এ ঐক্য ক্রমশ নিম্নস্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। জানা যাচ্ছে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে একে অপরের হাতে প্রকাশ্যে জলপান করছে। রোজই মিটিং, মিছিলে এই ঐক্যকেই সবার উপরে তুলে ধরা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া নেতাদের সামনে দু'টি পথ উন্মুক্ত ছিল। এক, জনগণের মৌল অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন এবং যা হবে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াইয়েরই নামান্তর। নতুবা কেবল নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য আশু কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক সমস্যাকে টেনে এনে তার ভেতর দিয়ে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আক্রোশকে নিঃশেষিত করার সুযোগ দেয়া এবং সেই সাথে কিছু শাসনতান্ত্রিক সুবিধাও নিজেদের শ্রেণির জন্য আদায় করা। বলাবাহুল্য গান্ধিজি ও খিলাফতপন্থিরা এই শেষোক্ত বা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছিলেন।

তথ্যের দিক দিয়েও লক্ষ্যণীয়, কীভাবে খিলাফতের সাথে পাঞ্জাবের প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত মেশানো হয়েছিল। গান্ধিজি প্রথমে এর বিরোধী ছিলেন। মিসেস অ্যানি বেশান্ত লিখেছেন—

> এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, মি. গান্ধি ১৯২০ সালের মার্চে খিলাফতের জন অসহযোগ আন্দোলনকে অন্য কোনো প্রশ্নের সাথে মেশাতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল খিলাফত 'হিন্দু'দের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হচ্ছে না। তখন বেনারসে ৩০ ও ৩১ মে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং সংস্কারবিধির দোষ-ত্রুটীকে আন্দোলনের কারণগুলির তালিকায় যুক্ত করল।[৪০]

৪০. অ্যানি বেশান্তের বক্তৃতা; উদ্ধৃতির জন্য; মজুমদার, ৩য় খণ্ড; পৃ. ৮২৭।

খিলাফত প্রশ্নকে কেন পাঞ্জাবের অন্যায়ের সাথ মেশানো উচিত হবে না সে মর্মে গান্ধিজি ১৯১৯ সালের ২৪ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্সের সভায় এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—

> আমাদের উচিত খিলাফত প্রশ্নটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা। অবশ্য যদি আমরা চাই এর পূর্ণ মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করতে।[৪১]

মনে রাখা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে গান্ধিজি নিজেই বলেছেন যে, তাঁর কতিপয় বন্ধু তাঁকে পাঞ্জাবের প্রশ্নটিকে খিলাফতের সাথে জড়াতে বলেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁদের সে পরামর্শ গ্রহণ করেননি।

খিলাফত আন্দোলনে গান্ধিজির ভূমিকাটি আকর্ষণীয়। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস নরমপন্থিদের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হলো। নরমপন্থি বা লিবারেলরা খিলাফত এবং পাঞ্জাবের চেয়ে ইংরেজ প্রদত্ত সংস্কারাবলির প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে তার চিরাচরিত 'প্রার্থনা, পিটিশন ও প্রতিবাদ' থেকে এক শক্তিশালী গণআন্দোলনের রূপ দিল। অপরদিকে লিবারেলরা শুধু যে কংগ্রেস থেকে নিজেদের দূরে রাখলেন তাই নয় সরকারি উচ্চপদে আসীন হয়ে তারা অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতায় নেমে পড়লেন।[৪২]

খিলাফত আন্দোলনের ভেতর দিয়ে গান্ধিজি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে গান্ধিজি নেতৃত্বে আসার পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য তীব্র ছিল এবং বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করেননি। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রমাণ করে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা। এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত লোকমান্য তিলকের বক্তৃতায় ঐক্যের সুরটি সুস্পষ্ট ছিল। তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এর ফলে জাতি, বর্ণ, রাজনীতি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে একই মতে সমবেত হওয়া সম্ভব হলো। ইংরেজদের তরফে 'মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারে'র (১৯০৯) মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন নীতি চালু করে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চললেও দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে খুব একটা বড়ো ধরনের অপ্রীতিকর সংঘর্ষ ঘটেনি। সাইমন রিপোর্টেও

৪১. মহাত্মা; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৭৩।
৪২. প্রাগুক্ত; ২য় খণ্ড; পৃ. ৩১।

(১৯৩০) এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। '...in British India a generation ago... Communal tension as a threat to civil peace was at a minimum.' তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে গান্ধিজি যদিও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে তার যুক্তিসঙ্গত গণতান্ত্রিক পরিণতিতে নিয়ে যাননি তবু একটা স্তর পর্যন্ত তিনি সেই ঐক্যের বক্তব্যকে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং যা গণজাগরণে সাহায্য করেছিল। আন্দোলন চলাকালীন এমন একটি জনসভা ছিল না যেখানে তিনি ঐক্যের সপক্ষে একটি কথাও বলেননি, শুধু ঐক্যের কথা নয়, চাক্ষুষ ভাবেও তিনি আলীভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ মুসলমান নেতাদের নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে ঐক্যের বক্তব্যটিকে শুধু তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, সেটিকে একটি বাস্তবোচিত মর্যাদাও দিয়েছিলেন।

কিন্তু যে খিলাফতকে কেন্দ্র করে 'হিন্দু-মুসলমান' ঐক্য সম্পর্কে এত সোচ্চার ছিলেন সেই খিলাফতের অন্যায় প্রতিকারের জন্য যখন বিদেশি দ্রব্য বিশেষ করে ইংল্যান্ডের বস্ত্র 'বয়কটে'র প্রস্তাব এলো তখন তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন। এ ব্যাপারে গান্ধিজির বক্তব্যই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯১৯ সালের ২৪ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া খিলাফত কনফারেন্সে সভাপতি হিসেবে গান্ধিজি বললেন—

> কমিটি গতরাত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যদি খিলাফত প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা না হয়, তাহলে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করা হবে। বয়কট প্রতিশোধের রূপ এবং যদি বলা হয় একটা ন্যায়সঙ্গত সমাধানে সাহায্য করবে তাহলে আমাদের বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের বলতে আগ্রহী যে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের ঘোষণা করে তাঁরা বিশ্ব জনমতকে তাঁদের অনুকূলে আনতে পারবেন না।[৪৩]

লক্ষ্যণীয়, বক্তৃতাটি গান্ধিজি উর্দুতে দিয়েছিলেন। যাই হোক, এটা অবশ্যই বিস্ময়ের ব্যাপার প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে (১৯১৪-১৯১৯) কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী লালসায় যখন ইউরোপ দ্বিধা-বিভক্ত, একে অপরের সম্পর্কে ঈর্ষাকাতর তখন ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করলে কীভাবে বিশ্ব জনমত ভারতের প্রতিকূলে যাবে? প্রতিকূল অবস্থায় যদি কেউ পড়ে— সে হবে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা। আন্দোলনের নেতা যদি 'বয়কট'কে প্রতিশোধ মনে করে অগ্রাহ্য করেন তাহলে হতবাক হওয়া ছাড়া আর কী থাকতে পারে। অথচ পরবর্তীকালে গান্ধিজির বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় 'বয়কটে'র উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাঁর তাৎক্ষণিক ছিল।

৪৩. প্রাগুক্ত; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৭৩।

তিনি এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

> 'সে সময়ে আমার কাছে তক্ষুণি বিদেশি বস্ত্র বর্জন অসম্ভব মনে হয়েছিল। আমি তখন জানতাম না যে আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী বস্ত্র অর্থাৎ খাদি প্রস্তুত করতে পারব—এটি আমার পরবর্তী আবিষ্কার। অপরদিকে আমি তখনো পর্যন্ত জানতাম যে, যদি বিদেশি বস্ত্র বর্জনের জন্য মিলের উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে আমরা হব প্রতারিত।'[৪৪]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫-১১) সময়ে দীর্ঘ ছ-বছর ধরে বিলাতি বস্ত্র বর্জন হয়েছিল সক্রিয়ভাবে এবং যে আন্দোলনে জয়ের অন্যতম কারণ ছিল বয়কট। তখন নিশ্চয় মিল থেকে কাপড়ের সব চাহিদা মেটে নাই। মিটেছিল বেশ কিছুটা 'স্বদেশী' থেকে। আশ্চর্য্য এই, গান্ধিজি তথ্যের দিক থেকে এ সব সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল থেকেও আন্দোলনের শুরুতে বস্ত্র বয়কটের মতো একটি ধারালো অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে রাজি ছিলেন না। অবশ্য সেই অস্ত্রই আন্দোলনের প্রায় এক বছর পরে (৩১ জুলাই, ১৯২১) তিনি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির পীড়াপীড়িতে আইন অমান্য আন্দোলন সূচনা করতে গিয়ে প্রয়োগ করেন। কিন্তু মৌলানা হসরত মোহানী যে সময়ে এই বস্ত্র বয়কটের প্রস্তাব রাখেন এবং যা গান্ধিজি অগ্রাহ্য করে দেন—সে সময়ে মৌলানার বক্তব্য ছিল অতি পরিষ্কার। 'আমরা চাই এমন কিছু, যা ব্রিটিশের উপর তৎক্ষণাৎ প্রভাব ফেলবে।'[৪৫]

যাই হোক, খিলাফত কমিটি গান্ধিজি প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগকে আন্দোলনের একমাত্র পথ বলে মেনে নিল। তিনি তাঁদের প্রতি শুধু হিন্দুদের সমর্থনের নিশ্চয়তা দিলেন তাই নয় প্রয়োজনে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রদেরও আত্মোৎসর্গের ইচ্ছার কথা জানালেন।[৪৬] তিনি বললেন, খিলাফতের প্রশ্ন অতীব গম্ভীর—তাই এর প্রয়োজন দ্রুত প্রতিকারে।[৪৭] 'প্রতিবাদ দিবস' উপলক্ষে (১৯ মার্চ ১৯২০) বোম্বাইয়ের খিলাফত মিটিংয়ে গান্ধিজি বললেন—

> আমি জানি যতদিন না অন্যায়ের প্রতিকার হচ্ছে এবং আট কোটি মুসলমানদের মনোভাবের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হচ্ছে, ততদিন সরকার

৪৪. প্রাগুক্ত; ২য় খণ্ড; পৃ. ২৭৪।
৪৫. প্রাগুক্ত
৪৬. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃষ্ঠা-৬৭।
৪৭. মহাত্মা; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৭৪

বা জনসাধারণ কারুর ক্ষেত্রেই শান্তি বা বিশ্রাম নেই।[৪৮]

১ আগস্ট, ১৯২০ সালে যুদ্ধের সময়ে সেবার জন্য যে সমস্ত পদক ইংরেজদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন সেগুলি গান্ধিজি ভাইসরয়কে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন—

> খিলাফত আন্দোলন উপলক্ষ্যে আজ থেকে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো তার জের হিসেবে আপনাকে পদকগুলো ফেরত পাঠাচ্ছি। আমার কাছে গৌরব হিসেবে এগুলো যত মূল্যবানই হোক না কেন, যতদিন আমার স্বদেশবাসী মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবপ্রবণতার উপর আঘাত ঘটতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি এগুলি সহজ বিবেক নিয়ে পরতে পারি না।[৪৯]

খিলাফত আন্দোলন উপলক্ষ্যে গান্ধিজির এই সমস্ত উক্তি থেকে এক বিবেকবান নেতার চিত্র ফুটে ওঠে। যিনি আট কোটি মুসলমানের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য পরিজনসহ আত্মবিসর্জনেও কৃতসংকল্প এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রেখে ব্রিটিশ সরকারের শান্তি কেড়ে নেবেন। কিন্তু দু-বছরের কিছু কম সময় সংগ্রাম চলার পর, লক্ষ্য থেকে তখনো বহুদূরে—তিনি চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ এই সংগ্রাম স্থগিত রাখলেন। খিলাফতের আন্দোলন সফল না হওয়ার কারণ হিসেবে জানালেন—

> সমস্ত হিন্দু স্বেচ্ছাবেকরা এখনও পর্যন্ত নিজেদের অস্পৃশ্যতার পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেনি। সবাই হিংসার ছোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। তাদের কারাবাসের দ্বারা আমরা 'স্বরাজ' জয় অথবা খিলাফতের পবিত্র স্বার্থ রক্ষা করতে পারব না...[৫০]

জওহরলাল নেহেরু, যিনি আন্দোলনের একজন প্রথম সারির সৈনিক হিসেবে এ সময়ে জেলে বন্দি ছিলেন তিনি লিখছেন—

> যখন আমাদের মনে হচ্ছিল যে, আমাদের অবস্থা দৃঢ় হচ্ছে এবং আমরা সমস্ত ফ্রন্টেই এগুচ্ছি ঠিক সেই সময়ে আমাদের সংগ্রাম বন্ধ করে দেয়া শুনে খুবই ক্রুব্ধ হয়েছিলাম।[৫১]

আর ওই একই লেখায় হিংসা সম্পর্কে গান্ধিজির বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে

---

৪৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২৮৬।

৪৯. উদ্ধৃতির জন্য, মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৭৫।

৫০. মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৮৫।

৫১. নেহেরুর উক্তি; উদ্ধৃতির জন্য, মজুমদার; ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০। 'আত্মচরিত'; পৃ. ৮৬।

প্রশ্ন রাখলেন যে, তাহলে কি ভারতের তিনশো মিলিয়ন লোককে তত্ত্ব ও কাজের দিক দিয়ে পুরো অহিংসার ট্রেনিং না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আন্দোলন করা যাবে না।" (তাঁর ভাষায়— 'Must we train the three hundred odd millions of India in the theory and practice of non-violent action before we could go forward?') আন্দোলন যে সাফল্যের সাথে এগোচ্ছিল এ ব্যাপারে শুধু নেহেরু, সুভাষচন্দ্র নয় প্রবীণ নেতা মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় প্রমুখও একমত ছিলেন। এতবড়ো আন্দোলনে যে কোথাও ছোটোখাটো হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটবে না এমন অসম্ভব চিন্তা গান্ধিজি ব্যতীত আর কেউ করেননি। গান্ধিজির বিচারের সময়ে বিচারপতি মি. ব্রুমফিল্ড তাঁর রায়ের মধ্যে হিংসার প্রশ্নটি তুলে গান্ধিজির উদ্দেশ্যে বলেছেন—

> আপনার রাজনৈতিক শিক্ষার প্রকৃতি এবং যাদের লক্ষ্য করে প্রচারে নেমেছেন তাদের প্রকৃতির কথা মনে রাখলে আমি বুঝতে পারি না আপনি কী করে এ বিশ্বাস অব্যাহত রেখেছেন যে, ফলাফল হিংসা ও অশান্তিজনক হবে না?[৫২]

যা নেহেরু থেকে ব্রুমফিল্ড পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছিল, তা গান্ধিজির মতো একজন বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিবিদের চিন্তার বাইরে ছিল এ কথা মনে হয় না। অথচ গান্ধিজির বক্তব্য থেকে মনে হয় হঠাৎ যেন তিনি 'হিংসার ছোঁয়া'কে আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছেন! সত্যই কী তাই? গান্ধিজির নিজের বক্তব্য আন্দোলন শুরু করার সময় কিন্তু অন্য কথা বলে। ২২ জুন, ১৯২০ ভাইসরয়কে লেখা চিঠিতে অসহযোগ আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা করেন গান্ধিজি এবং মুসলমানদের যে অংশ হিংসার পথে চলতে আগ্রহী তাঁদের তিনি কীভাবে বুঝিয়ে অহিংস আন্দোলনের পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন সে কথাও জানান। তবে সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন—

> একই সাথে আমি স্বীকার করি যে, যেখানে এক বিরাট জনতা আন্দোলনে নেমেছেন সেখানে একটা ভয়ংকর ঝুঁকি থেকে গেছে। কিন্তু যে সংকট ভারতে মুসলমানদের ঘিরে ফেলেছে, সেখানে ঝুঁকি ছাড়া কোনো পদক্ষেপ কাম্য পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু ঝুঁকি না নেয়ার অর্থ হবে আরো বড়ো ঝুঁকি নেয়া—সেটি হয়তো সম্পূর্ণ আইন শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করতে পারে।[৫৩]

---

৫২. মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ১০১

৫৩. প্রাগুক্ত; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৯৭

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে গান্ধিজি একেবারে অজ্ঞাত ছিলেন না এবং ভারতের মতো বিরাট দেশে চৌরিচৌরা থানার মতো দু-একটা ঘটনা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল না। কেননা তাঁর কথায় এ ধরনের ঝুঁকি না নেওয়ার অর্থ হবে আরো বড়ো ঝুঁকি নেওয়া। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সাথে সাথে দেশবাসীর সামনে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য গান্ধিজি নতুন পথের দিশা জানাতে ভুললেন না। এর জন্য একটি লোককেও আইন অমান্য করতে হবে না। তাঁর বক্তব্য—

> আত্মিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে সত্যবাদী ও অহিংস হয়ে এবং স্বদেশি অর্থাৎ খদ্দরের কর্মসূচি সম্পূর্ণ করে আমরা পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং খিলাফতের প্রতিবিধান ও পাঞ্জাবের অন্যায় দূর করতে পারি।[৫৪]

খদ্দরের কর্মসূচি ব্যবহারিক। হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। কিন্তু 'সত্যবাদী ও অহিংস' হওয়া—যা একটি মানসিক প্রক্রিয়া ও সচেতন প্রয়াসের উপর নির্ভরশীল তা ত্রিশ কোটি লোকের ক্ষেত্রে কতদিনে ঘটবে সহজেই অনুমেয়। আর সেই অনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত গান্ধিজির নির্দেশিত পথ গ্রহণ করে খিলাফতকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কিন্তু গান্ধিজি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, আন্দোলনের শুরুতে তিনি মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যদি অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় তাহলে তাঁদের শাস্ত্রানুযায়ী নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার থাকবে। খিলাফতের ঐতিহাসিক প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯ মার্চ, ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ের মিটিংয়ে গান্ধিজি বলেছিলেন—

> ঘটনাক্রমে যদি অহিংস অসহযোগ ব্যর্থ হয় তাহলে তাঁদের সুবিচার পাওয়ার জন্য অধিকার আছে সেইসব পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার যেগুলি ইসলামি শাস্ত্রের দ্বারা আদিষ্ট হবে।[৫৫]

প্রস্তাবিত আন্দোলনের উল্লিখিত স্তরগুলি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ অহিংস উপায় ব্যর্থ হলে শেষ স্তরটি রক্তাক্ত বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাবে তাঁর কথায়, 'The last stage being a bloody revolution'[৫৬] এখন দেখা গেল অহিংস শান্তিপূর্ণ অসযোগ আন্দোলন ব্যর্থ বলে স্বীকার করেও গান্ধিজি প্রস্তাবের শেষ স্তরটি বলবৎ করলেন না।

---

৫৪. প্রাগুক্ত; ২য় খণ্ড; পৃ. ৮৭
৫৫. প্রাগুক্ত; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৮৫
৫৬. প্রাগুক্ত; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৮৭

খিলাফত আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। খিলাফতের মুসলমান নেতারা শুধু যে গান্ধিজির কাছে 'প্রিয়ভ্রাতা' বা 'Dear Brother' ছিলেন তাই নয় হিন্দুরা 'গান্ধি কী জয়'-এর সাথে 'মহম্মদ আলী, সৌকত আলী কী জয়' ধ্বনিও বিপুল উৎসাহে দিতে লাগল। গান্ধিজি এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধ্বনির বদলে জনসাধারণকে নতুন তিনটি ধ্বনি দেয়ার আহ্বান জানালেন। আল্লাহু আকবর, ভারত মাতা কী জয় এবং হিন্দু-মুসলমান কী জয়! অচিরেই এই আওয়াজগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তৎকালীন প্রথম সারির এমন কোনো হিন্দু নেতা ছিলেন না যিনি নিজেকে খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। ১ ও ২ জুন, ১৯২০ এলাহাবাদে সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটির মিটিং হয়। আলোচ্যসূচি ছিল তুরস্কের উপর চাপিয়ে দেওয়া মিত্রপক্ষের শান্তি চুক্তি। সেই মিটিংয়ে গান্ধিজির সাথে যোগ দেন মতিলাল নেহেরু, লাজপত রায়, তেজবাহাদুর সপ্রু, বিপিন পাল, মদনমোহন মালব্য, সত্যমূর্তি, রাজাগোপালাচারী, জওহরলাল নেহেরু এবং চিন্তামনি।[৫৭] চিত্তরঞ্জন দাশ শুধু সমর্থন করেননি, আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। খিলাফতের জন্য হিন্দু-মুসলমানের যে প্রতিনিধিদল ১৯ জানুয়ারি, ১৯২০ সালে ভাইসরয়ের সাথে দাবিপত্র নিয়ে দেখা করেন তার মধ্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দও ছিলেন। লোকমান্য তিলক সম্পর্কে কংগ্রেসের সরকারি ইতিহাসে বলা হয়েছে, খিলাফত আন্দোলনে তাঁর হৃদয়ের সাড়া ছিল না।[৫৮] কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল: 'মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী খিলাফত প্রশ্ন সমাধানের মুসলমানদের দাবিকে এই দল সমর্থন করে।[৫৯] তিলকের ইচ্ছা ছিল কাউন্সিলে প্রবেশ করে খিলাফতের প্রতিবিধান করা।[৬০] অবশ্য তিনি সৌকত আলীকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যদি মুসলমানরা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অসহযোগ এবং কাউন্সিল বয়কট করে তাহলে তাঁর দল ও হিন্দুরা সেই পথই অনুসরণ করবে।[৬১] শুধু নেতা নয় সাধারণ মানুষের ঐক্যও বিস্ময়কর ছিল। ১৯১৯ সালের সরকারি রিপোর্টে বলা হচ্ছে— 'হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব সৌভ্রাতৃত্বের... সৌভ্রাতৃত্বের অসাধারণ সব দৃশ্য দেখা

---

৫৭. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৭১
৫৮. উদ্ধৃতির জন্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৫৯. মহাত্মা; ১ম খণ্ড; পৃ. ২৮৯
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

যাচ্ছে।'[৬২] সমসাময়িক সাংবাদিক দুর্গা দাস লিখেছেন, 'এই প্রথম খিলাফত আন্দোলনের ফলে জেলা সরকারি কর্মচারীরা হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্ব দেখতে পেলেন।'[৬৩] গান্ধিজির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও চমকপ্রদ। তিনি আর সৌকত আলি ব্যাঙ্গালোরের মিটিং সেরে রাত্রের ট্রেনে মাদ্রাজ ফিরছিলেন। মাঝরাতে জনতা জোলারপেট জংশনে ট্রেনকে চল্লিশ মিনিটেরও বেশি দাঁড় করিয়ে রাখল। মৌলানা সৌকত আলী মুগ্ধ জনতাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারা তা শুনবে না। বরং আরো জোরে 'মৌলানা সৌকত আলী কী জয়' ধ্বনি দিতে লাগল। এরা প্রায় কুড়ি মাইল দূর থেকে এসেছে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে কেবল একবার দেখবার জন্যে। কামরার মধ্যে ঢুকে ঘুমোবার ভান করেও রেহাই নেই। জনতা তখন ফুটবোর্ডে উঠে উঁকি দিয়ে মৌলানাকে দেখতে শুরু করেছে।[৬৪]

মুসলমানদের ক্ষেত্রে খিলাফত জীবন-মরণের ব্যাপার ছিল। অগ্রগণ্য সমস্ত মুসলমান নেতা এই আন্দোলনে জড়ো হয়েছিলেন। এমনকি জিন্না ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনে যোগ না দিলেও মুসলিম লীগকে আন্দোলনে যুক্ত হতে বাধা দেননি।[৬৫] প্রখ্যাত চিকিৎসক হাকিম আজমল খাঁ সরকার প্রদত্ত উপাধি ও পদক প্রত্যর্পন করেন। মুসলমান সৈনিকদের বিদ্রোহ করতে বলার অপরাধে আলীভ্রাতৃদ্বয় ও কয়েকজন মুসলমান নেতার দু-বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হসরত মোহানী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের কথা বলেন। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ড হলো।[৬৬]

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে— মুসলমানরা এই আন্দোলনে এক সক্রিয় ও উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা নেয়ার ফলে অনেকাংশে হিন্দুদের চেয়ে তাঁরা বেশি নির্যাতিত হয়েছিলেন।[৬৭] বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে এটা তাঁদের অভিযোগ ছিল যে, বিরাট জনগণের এক সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ হওয়া সত্ত্বেও বোঝার বেশিরভাগ চাপটা

৬২. রিপোর্টের উদ্ধৃতি; ইন্ডিয়া টুডে; রজনী পাম দত্ত; পৃ. ৪০৬; কলিকাতা, ১৯৭০।

৬৩. ইন্ডিয়া ফ্রম কার্জন টু নেহেরু অ্যান্ড আফটার; দুর্গাদাস , পৃ. ৮১; লন্ডন, ১৯৬৯।

৬৪. মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৭

৬৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ২৮৭

৬৬. দুর্গাদাস; পৃ. ৯৭

৬৭. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১১৫। মাইকেল ব্রেচার বিস্ময়ে বলেছেন, 'Strangely enough, it was the Khilafat Committee that took the lead; 1st August 1920 was proclaimed the date for the inauguration of non-co-operation.'। দ্র. 'নেহেরু : এ পোলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি'; মাইকেল ব্রেচার; পৃ. ৭০, লন্ডন, ১৯৫৯।

তাঁদের স্কন্ধে নিতে হচ্ছে। তথ্যের দিক থেকে এই অভিযোগকে রমেশচন্দ্র মজুমদার সত্য বলে স্বীকার করেছেন। ১৯২১ সালের দিকে একটি খবর শোনা যায় যে, আফগানিস্তানের আমীর ভারত আক্রমণ করতে পারে। গান্ধিজির দৃঢ় ধারণা হয় এটি আন্দোলন থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য ব্রিটিশদের কারসাজি। তিনি জনসাধারণকে এ ধরনের গুজবে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ ও আন্দোলনের বিরোধীরা গান্ধিজি এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য মৌলানা মহম্মদ আলীর নামে এক তথাকথিত বানানো বক্তব্যকে বিশেষ প্রচার দেয়। আফগানরা ভারত আক্রমণ করলে তিনি নাকি সাহায্য করবেন। মহম্মদ আলীর নামে এ ধরনের গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। গান্ধিজির মতে ভাইসরয় মহম্মদ আলীকে মনে করতেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রধান সূত্র। যদি গান্ধিজি ও মহম্মদ আলীর মধ্য কোনোরকমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায় তাহলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য।[৬৮] ১৯২৩ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে মহম্মদ আলী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, দেশ যদি আক্রান্ত হয় আক্রমণকারী মুসলমান হোক আর অ-মুসলমান, তিনি তাদের প্রতিরোধ করবেন।[৬৯]

মহম্মদ আলী জিন্না, তিনি যে সময়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন—খিলফত আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন।[৭০] তিনি আন্দোলনে ধর্মের সংমিশ্রণের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা প্রাধান্য পাবে। তিনি একই সাথে বলেন যেহেতু দেশ রক্তাক্ত বিপ্লবের জন্য তৈরি নয় তাই আন্দোলনও নিষ্ফল। জিন্না হিন্দু নেতাদের সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁদের আন্দোলনে তুরস্কের সুলতান প্ররোচিত প্যান-ইসলামিক ভাবপ্রবণতা জোরদার হবে, ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবোধ শিথিল হবে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে প্যান-ইসলামের চিন্তাধারা খিলাফাত প্রশ্ন সৃষ্টি করেছিল—যা ভারতীয় জাতীয়তার মূলে আঘাত করেছিল।[৭১]

মনে রাখা প্রয়োজন, ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের কাছে ইসলামের গৌরব ও প্যান-ইসলামের অনুকূলে প্রচারের প্রধান আক্রমণস্থল ছিল ব্রিটিশ

---

৬৮. মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৪২-৪৩।

৬৯. উদ্বৃতির জন্য, মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৮৩০।

৭০. দুর্গাদাস; পৃ. ৭৭।

৭১. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ৬০।

সাম্রাজ্যবাদ। এ ব্যাপারে তাঁরা হিন্দু বুর্জোয়াদেরই এক অংশকে প্রকৃতপক্ষে অনুসরণ করেছিলেন। যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন এবং খ্রিষ্টীয় ধর্মকে হিন্দুধর্মের চেয়ে অনেক নিম্নমার্গের বলে প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সভ্যতার সুমহান আদর্শের উপর যেমন জোর দিলেন তেমনি লোকমান্য তিলক গণেশ পূজার বিরাট আয়োজন করে ব্রিটিশ বিরোধী জমায়েত তৈরি করলেন।

সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছরের কিছু কম সময় ধরে সমগ্র মুসলমান জাতি ব্রিটিশদের বিষ নজরে পড়েছিল। অন্যদিকে নবজাগ্রত হিন্দু বুর্জোয়ারা সহযোগিতা ও সেবার দ্বারা সরকারের অনেক সুযোগ-সুবিধা সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদায় করতে সমর্থ হয়। আবার অন্যদিকে যে মধ্যবিত্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তারা আরো বেশি ক্ষমতা ও সুযোগের জন্য ব্রিটিশ বিরোধিতা আরম্ভ করল। তবে সবাই নয়—উদ্যমী সচেতন এক অংশ। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তেমনি কিছুটা দেরি হলেও মুসলমান বুর্জোয়াদের এক অংশ স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের (১৮১৭-১৮১৮) নেতৃত্বে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতাকে ধ্যান-জ্ঞান করে 'আলিগড় আন্দোলনে'র মাধ্যমে ব্রিটিশদের প্রতি সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। যার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটল ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যেহেতু হিন্দু বুর্জোয়ারা পূর্ব হতেই সিংগভাগ পেয়ে গিয়েছিল, তাই এই সহযোগিতা থেকে যে ছিটে-ফোঁটা এলো তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সংখ্যায় স্বল্প হলেও—আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পুরো সন্তুষ্ট করতে পারল না। নেহেরু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ সম্পর্কে যা বলেছেন—

> ইংরেজদের শাসননীতি ক্রমেই জাতীয় আন্দোলন বিরোধী মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে শুরু করে। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান তরুণ সম্প্রদায় রাজনীতিক কার্যকলাপ ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করার আগ্রহ দেখায়।[৭২]

এটা লক্ষ্যণীয় যতদিন মুসলমান বুর্জোয়ারা সহযোগিতাকেই একমাত্র পথ বলে মনে করেছে ততদিন পর্যন্ত প্যান-ইসলাম বা খলিফার মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ক্রমঃবর্ধমান অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ থেকে জনগণের দৃষ্টিকে

৭২. ভারত সন্ধানে; পৃ. ৩৮৭।

অন্যত্র সরাবার জন্যে তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীল সুলতান আবদুল হামিদ (যিনি খলিফাও ছিলেন) প্যান-ইসলাম আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তরুণ তুর্কীরা যখন তাঁকে উৎখাত করলেন তখন কিন্তু ভারতের মুসলমানেরা সুলতানের অনুকূলে অথবা প্যান-ইসলামের স্বপক্ষে সামান্যতমও সরব হননি। তাঁদের কাছে তুরস্কের ভবিষ্যৎ কোনো দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। তরুণ তুর্কিরা প্যান-ইসলাম আন্দোলনে সমাপ্তি টেনে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারা যখন সহযোগিতার পথ থেকে সরে এসে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করল—তখনই দেখা গেল তারা খলিফার অস্তিত্ব সম্পর্কে ও প্যান-ইসলামের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হতে আরম্ভ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংরেজের বিপক্ষে গেল আর ভারতবর্ষেও শুরু হলো খিলাফতের ভাবনা। যদিও খোদ তুরস্কেই তখন খলিফারূপে সুলতানের মর্যাদা তরুণ তুর্কিদের দাপটে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে এটাও অজানা ছিল না যে, প্যান-ইসলামের সামন্ততান্ত্রিক পরিকল্পনা তৎকালীন তুরস্কের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিণতির পক্ষে যথেষ্ট মারাত্মক ছিল। কিন্তু হিন্দু বুর্জোয়াদের মতো তাঁরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জমায়েতের অনুকূলে প্যান-ইসলামের মতো সামন্ততান্ত্রিক আদর্শের স্বপক্ষে জিগির তুললেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণির ভিত্তিটি মোটামুটি অভিন্ন ছিল বলেই তাদের মধ্যে ঐক্যটি দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল।

কিন্তু বিশ শতকের গোড়ায় ভারী শিল্প প্রবর্তনের সাথে সাথে ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তনের ঢেউ লাগল। সেই সাথে নিজেদের শাসন ও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রেলপথ প্রবর্তন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত করতে বাধ্য হলো। প্রয়োজন হলো ভারতীয় কর্মচারী ও শ্রমিক সংগ্রহের। ইংরেজি শিক্ষারও প্রসার ঘটল। ফলে ব্রিটিশ শিল্পে নিয়োজিত একদল শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থানের কারণে যেমন কিছুটা সন্তুষ্টি ঘটল তেমনি কর্মস্থানের নানা অসুবিধা—চাকুরির স্থায়িত্ব, বৈষম্য, কাজের ঘণ্টা, মালিকের শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপ প্রভৃতি নিয়ে ক্রমশ অসন্তোষ তীব্র হতে লাগল। আবার অপরদিকে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা যত সংকুচিত হতে লাগল তত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ বিরোধী

মনোভাব তীব্র হতে লাগল। এই রকম এক বিস্ফোরকজনক পরিস্থিতিতে খিলাফত আন্দোলনকে কেবল এক সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় চিন্তার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না। তাই যুক্ত হয়েছিল কর বন্ধের প্রস্তাব। চিন্তা করা হয়েছিল স্বরাজের—আরো এক ধাপ এগিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার। যদিও সে সত্য প্রস্তাব গান্ধিজির বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য হয়েছিল। আন্দোলন যত এগোতে লাগল কংগ্রেসের সাথে সাথে মুসলমান নেতা ও জনতার মধ্যেও সংগ্রামী মেজাজ পরিস্ফুট হলো। মুসলমান নেতারাই কেবল হিন্দুদের মতো কারাবরণ ও নির্যাতন ভোগ করেননি—মালাবারের মোপলা কৃষকরা অত্যাচারী জমিদার ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মোৎসর্গের এক মহান দৃষ্টান্ত রাখলেন। ১৯১৯ সালে অমৃতসর অধিবেশনে মুসলিম লীগ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে মুসলমানদের যোগ না দেওয়ার আহ্বান জানায়। ১৯২২ সালের জুন মাসে খিলাফত এবং জমায়েত-উল-উলেমা লক্ষ্ণৌতে তাদের মিলিত অধিবেশনে প্রস্তাব নেয় কংগ্রেস যেন ভারত ও মুসলমানদের স্বার্থে স্বরাজের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে। তা করতে গেলে কংগ্রেস সংবিধানে মৌল পরিবর্তন ঘটাতে হবে, এই কারণ দেখিয়ে কংগ্রেস নেতারা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।[৭৩]

খিলাফত আন্দোলনে মোহাম্মদ আলী জিন্না মোল্লাদের প্রাধান্যের আশঙ্কা করেছিলেন আর প্রবীণ ঐতিহাসিক দেখেছিলেন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংকীর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তাঁদের চোখে পড়েনি খিলাফত, পাঞ্জাব ও স্বরাজের ত্রিবেণী সংগ্রাম। যাতে অবগাহন করেছিলেন জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সমগ্র জনসাধারণ। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর তার গভীরতা পরিমাপের জন্য জাতীয় কংগ্রেস এক অনুসন্ধান কমিটি বসায়। যার সদস্যরা সমালোচকদের দৃষ্টিতে ছিলেন যথেষ্ট নিরপেক্ষ। কমিটির মতে, আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য জনগণের নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকারের অসীম ক্ষমতা।[৭৪] ইংরেজের সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯২১ সালের দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ

---

৭৩. রজনী পাম দত্ত; পৃ. ৪৬৭।

৭৪. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১৮৯। মুজফ্‌ফর আহমদ সক্রিয়ভাবে খিলাফত আন্দোলনে যোগ না দিলেও তিনি লিখেছেন, 'খিলাফত আন্দোলন ও তার প্রভাবে সৃষ্ট অসহযোগ আন্দোলন দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।' তিনি ওই সময়ে যুক্ত খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের অনেক সভা-সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রমজীবী মানুষরা দিনেরবেলা কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে সভাগুলি কলকাতায় রাতে হতো। দ্র. আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ; পৃ. ১০১-১০২।

গোলমালে, মায় শিল্প ও রেল ধর্মঘট এ সবই ঘটেছে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে। আর এর জন্য দায়ী গান্ধিজি, আলীভ্রাতৃদ্বয় এবং তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলি। স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে, ইংরেজদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য উত্তেজিত করত।[৭৫]

বাংলাদেশ ও আসামের চা বাগানে, বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলে, যুক্ত-প্রদেশের কৃষিক্ষেত্রে, অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের রেলে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের শিল্পাঞ্চলে যে শ্রমিক, কৃষকের বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে আন্দোলন ক্রমশ তার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হয়ে পড়ছিল, এর প্রতিক্রিয়া সমাজেও অনুভূত হলো। শহর-গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্ব এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা করল। প্রকাশ্যে একে অপরের হাতে শুধু জল গ্রহণ করল তাই নয়, পুরোনো সংস্কারপন্থি হিন্দুরা মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করতে শুরু করলেন। পর্দানসীন মুসলমান মহিলারা জনসভাগুলিতে দলে দলে যেতে লাগলেন। অন্যদিকে অনেকে আবার মহিলাদের ঘরোয়া মজলিসে গান্ধিজিকে সাদর আহ্বান জানালেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। যেখানে ওসব মজলিশে মুসলমান পুরুষদেরও চোখে ঠুলি পরে যেতে হতো, সেখানে গান্ধিজির বেলায় ছিল সবকিছু মাফ। ভাব প্রবণতার চূড়ান্ত বিকাশ দেখা গেল যখন সংখ্যালঘিষ্ঠেরা সংখ্যাগুরুর নিষিদ্ধ খাদ্য পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন এমনকি ধর্মীয় উৎসবেও।[৭৬]

মানসিক জগতেও এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ভয়, নির্যাতন হতাশা মন থেকে উবে গিয়েছিল। দূর প্রত্যন্ত গ্রামের লোক নির্ভীকভাবে আলোচনা করতে লাগল কংগ্রেস, স্বরাজ, পাঞ্জাব ও খিলাফত নিয়ে।

বস্তুত সাধারণ মানুষের কাছে খিলাফত আর খিলাফত ছিল না। ছিল খিলাফ উর্দুতে যার অর্থ 'বিরুদ্ধে'। লোকে খিলাফতকে খিলাফ মনে করে সরকার বিরোধিতায় সক্রিয়ভাবে নেমে পড়েছিল।[৭৭] ফলে সম্ভাবনা দেখা দিলো গণতান্ত্রিক ঐক্যের এক মজবুত ভিত্তির। যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এক দুশ্চিন্তার কারণ

৭৫. রিপোর্টের জন্য; মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১৮৩। গয়া কংগ্রেসের (১৯২২) নামে কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসের বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে– 'গত দু'বৎসর ছিল ভারতবর্ষে শক্তিশালী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময়কাল। কৃষক ও সর্বহারার জাগরণ ব্রিটিশের অন্তরে কাঁপুনি ধরিয়েছিল।' উদ্ধৃতির জন্য, মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ. ৩৫৩।

৭৬. মহাত্মা; ২য় খণ্ড; পৃ. ৩৪।

৭৭. প্রাগুক্ত।

হতো এবং জাতীয়তাবোধের মূলকে শিথিল করার বদলে আরো দৃঢ় করত। নেহেরু বলছেন, খিলাফত সংক্রান্ত গণআন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছিল।[৭৮]

রজনী পাম দত্তের মতে কংগ্রেস–খিলাফত ঐক্যকে অব্যাহত রাখা গেল না। গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস আচমকা আন্দোলন প্রত্যাহার করে ভাঙনের পথ সুগম করল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গান্ধিজি যখন অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার ডাক দিলেন তখন সমস্ত খিলাফত নেতারা প্রতিবাদ করেছিলেন।[৭৯] এরপর অবশ্যম্ভাবী জনমনে হতাশা দেখা দিলো। যার ফলশ্রুতি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিচ্ছেদ এবং হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদীরা এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিল। স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ জনগণের সংগ্রামের জায়গায় স্থান নিল ভ্রাতৃঘাতী ভয়াবহ দাঙ্গা। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দিনের আলোয় বেরিয়ে এল।

জওহারলল নেহেরু তাঁর 'আত্ম-চরিতে' প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> সহসা আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মুখে উহাই সম্ভবত দেশে এক নতুন বিপত্তির সৃষ্টি করল। রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিস্ফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হলেও অবরুদ্ধ হিংসা বের হওয়ার পথ খুঁজতে লাগল এবং সম্ভবত পরবর্তী কয়েক বৎসরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ এর ফলেই তীব্র হয়েছে! রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণির সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসংঘ-সমর্থিত অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, এই অবস্থার সুযোগে তারা বাইরে এলো।[৮০]

---

৭৮. ভারত সন্ধানে; পৃ. ৩৯২। The movement immediately assumed an anti-imperialist character, in so far as its members saw the collapse of the Ottoman Empire and the overthrow of the Sultan, the caliph as directly linked with the policy of the Western powers in the East, particularly that of Britain. হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ২য় খণ্ড; অ্যানটোনোভা, বনগার্ড-লেভিন, কোটেভস্কি; পৃ. ১৬৫, মস্কো ১৯৭৮। তাঁরা আরো বলেছেন, 'The parallel development of the Khilafat movement and the civil disobedience compaign created a favourable climate for the establishment of co-operation and joint action in the liberation struggle by the two main religious communities.' পৃ. ১৬৫।

৭৯. রজনী পাম দত্ত; ইন্ডিয়া টু ডে; পৃ. ৪৬৭।

৮০. আত্মচরিত; পৃ. ৯২।

নেহেরু এবং রজনী পাম দত্তের উপরোক্ত সমালোচনাগুলির সারবত্তা স্বীকার করে নিলেও গান্ধিজির এই হঠাৎ সিদ্ধান্তের (যা নেহেরুর ভাষায় আমরা কারাগৃহে বিস্ময় বিমূঢ় আতঙ্কে শুনলাম) মধ্যে তবু যেন কিছুটা রহস্য থেকেই যায়। গান্ধিজিকে যাঁরা কেবল একজন স্থূল রাজনীতিক না গণ্য করে কিছুটা দেবত্ব আরোপ করেন তাঁদের কাছে এই রহস্যটা খুবই সন্তোষজনক। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এই রহস্যের ব্যাখ্যা আত্মিক দিক দিয়ে করেন। টেনে আনেন হিংসা ও অহিংসার এক সমাজ, জীবন বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গ। নেহেরু ও দত্তের সমালোচনা থেকে মনের মধ্যে এক চিত্রকল্প উদিত হয়। একটা মেলট্রেন প্রচণ্ড গতিতে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু চালক যেন হঠাৎ বিপদের সংকেত পেয়ে আচমকা গাড়ির ব্রেক কষে দিলেন। একটা বড়ো অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আরো একটি অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেল। অর্থাৎ আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে কয়েকটি বগি উল্টে গেল, কাত হয়ে গেল। চালকও রক্ষা পেলেন না। নিজে হলেন আহত। গান্ধিজি তাঁর 'আত্মজীবনীতে'তে লিখেছেন—

> হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে জোরদার করার জন্য খিলাফতের স্বার্থে যে অসহযোগিতার নীতি কংগ্রেস নিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত বাস্তব উদ্যম।[৮১]

অতএব হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ভবিষ্যতে বিপন্ন হতে পারে এরকম কোনো সম্ভাবনা যদি তাঁর মনে উদয় হতো, তাহলে নিশ্চয় তিনি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিতেন না। স্মরণ করা যেতে পারে, কেবল মুসলমানদের স্পর্শকাতরতায় আঘাত করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি দিল্লির খিলাফত কনফারেন্সে (২৩ নভেম্বর, ১৯১৯) প্রস্তাবিত গোসংরক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা তুলতে দিতে অস্বীকার করেন। যদিও হাকিম আজমল খাঁ, আসফ আলির মতো নেতারা রাজি ছিলেন।[৮২] একথা ঠিক যে, সে সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমশ গণবিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। শ্রমিক, বিশেষ করে কৃষকদের আন্দোলন বিস্তৃত হচ্ছিল। কোথাও খাজনা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় বলা যায় সমগ্র আন্দোলনের উপর তাঁর নেতৃত্ব কোনো সময়েই শিথিল হয়নি। এর প্রমাণ গুন্টুর জেলার লোকেরা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করলে গান্ধিজি তাঁদের যখন ট্যাক্স মিটিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন— তখন বিশেষ কোনো অবাধ্যতা দেখা গেল না।

---

৮১. অ্যান অটোবায়োগ্রাফি; এম. কে. গান্ধি; পৃ. ৩০৭; আমেদাবাদ, ১৯৬৩।

৮২. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯২।

বারদৌলীতে তিনি যখন প্রতীক ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন বললেন, তখন অন্যত্র তাঁর অনুরোধে ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন স্থগিত রইল। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের তখনো পর্যন্ত গান্ধিবাদ বিরোধী চিন্তা এবং সংগঠন এমন কিছু জোরদার ছিল না যা তাঁর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। বরং দেখা যায় তৎকালীন লিবারেল দলের নেতা তেজবাহাদুর সপ্রু ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের হোম মেম্বারকে এক গোপন চিঠিতে জানাচ্ছেল— 'শ্রমজীবী শ্রেণিগুলির মধ্যে তিনি (গান্ধি) এবং তাঁর দল নিসঃন্দেহে প্রচণ্ড প্রভাব রাখেন, যা অগ্রাহ্য করা যয় না' (৯ অক্টোবর ১৯২১)।[৮৩] ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ১৯২০ সালে বোম্বাইতে আহুত প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতি হলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা লালা লাজপত রায়। অপরদিকে জওহরলাল নেহেরু এই আন্দোলন স্থগিত রাখাকে সমালোচনা করেও গান্ধিজির সিদ্ধান্তকে যথোচিত বলে যে যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেছেন তাও পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। নেহেরুর মতে, 'একটা নৈরাশ্যজনক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ১৯২২-এ নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছিল। তবে মনে হয় এ কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে করা যেত।' এর কারণ হিসেবে নেহেরু মনে করেছিলেন, 'দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাবার মতো পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নেই' আর 'কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি এবং বিদেশি শাসনের প্রতি অসন্তোষ যতই ব্যাপক হউক না কেন আমাদের উপযুক্ত মেরুদণ্ড ও সংঘ শক্তি ছিল না।' এক্ষেত্রে 'আন্দোলন চললে যে নানাস্থানে বল-প্রয়োগ ও উৎপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত এ কথা নিঃসন্দেহ ও তার ফলে গভর্নমেন্ট রক্তাক্ত উপায়ে তা দমন করে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করত যার প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত।'[৮৪]

জওহরলালের ব্যাখ্যাত কারণগুলির মধ্যে প্রকৃত ঘটনা যত না ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ব্যক্ত হয়েছে গান্ধিজির প্রতি তাঁর তন্নিষ্ট মনোভাব। যা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরও বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। মাইকেল ব্রেচারের ভাষায়—

> কিন্তু এর মধ্যেই (অর্থাৎ ১৯২০-২১) গান্ধিজির বিজ্ঞতার উপর জওহরলালের এত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সাংঘাতিক ভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিচারের উপর আস্থা রাখতে প্রস্তুত ছিলেন।[৮৫]

---

৮৩. গোপন চিঠির উদ্ধৃতির জন্য, দ্র. মাইকেল ব্রেচার; নেহেরু: এ পোলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি; পৃ. ৭৪।
৮৪. আত্মচরিত; পৃ. ৯১।
৮৫. মাইকেল ব্রেচার, পৃ. ৭৮।

প্রথমত 'দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাবার মতো পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নেই' তার প্রমাণ অন্তত ১৯২১ সালে পাওয়া যায় না। জওহরলালের 'আত্মচরিত' থেকেই জানা যায় 'বহু ব্রিটিশের মন ভেঙে পড়তে লাগল। ক্রমবর্ধিত বিরোধিতা এবং অবাধ্যতা যেন বর্ষার কালো মেঘের মতো সরকারি চিত্ত গগন ছেয়ে ফেলল। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে বলপূর্বক দাবিয়ে রাখার পথ খুঁজে পেলেন না।' নেহেরুর ভাষায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব সে সময় ছিল এই রকম—

> ভারতীয় সৈন্যদলকে কি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়? পুলিশ কি আমাদের আদেশ পালন করবে? ভাইসরয় লর্ড রিডিং ১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন যে, তাঁরা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।[৮৬]

আর এর মাত্র দু'মাস পরে ১২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হলো। ব্রিটিশদের নিকট পরিস্থিতি যখন এত জটিল, ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশের আনুগত্য সম্বন্ধেই যখন প্রশ্ন জেগেছে তখন তাদের পক্ষে সারা দেশকে রক্তস্নানে ডুবিয়ে দেওয়া সহজ হত কি না যথেষ্ট চিন্তার বিষয় ছিল। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার মাত্র তিন দিন পূর্বে ভাইসরয় (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২) ভারতসচিবকে এক গোপন টেলিগ্রামে তাঁর বিরাট দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন ('...the fact that great anxiety is caused by the situation')। তাঁর ভাষায়, "এটা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, অসহযোগ আন্দোলনের অনেকাংশই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা উদ্ভূত এবং সঞ্জীবিত।" সেই টেলিগ্রামে তিনি আরো জানাচ্ছেন যে, শহরের নিম্নশ্রেণিগুলি প্রভাবিত তো হয়েইছে উপরন্তু আসাম উপত্যকা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলার বেশকিছু অঞ্চলে কৃষকরা এগিয়ে আসছে। আকালি আন্দোলন পাঞ্জাবের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরো কোনো প্রচণ্ড গোলমালের জন্য।[৮৭] মাদ্রাজের নাম টেলিগ্রামে উল্লেখ না থাকলেও ১৯২২ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রিন্স অব ওয়েলস যখন সেখানে রাজসফরে গেলেন তখন সমগ্র মাদ্রাজবাসী কংগ্রেসের আহ্বানে তাঁকে পূর্ণ হরতাল পালন করে সংবর্ধনা জানালেন! এই ছিল যখন দেশের পরিস্থিতি তখন আন্দোলনের আরেক শরিক তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু নেহেরুর মতো মনে করেননি যে আন্দোলন টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো সংগঠন শক্তি কংগ্রেসের ছিল না। তাঁর ধারণায় 'যখন জনসাধারণের উৎসাহ ফেটে পড়ার স্তরে পৌঁছেছিল ঠিক সেই সময়ে পিছু হঠার

---

৮৬. আত্মচরিত; পৃ. ৭৫।

৮৭. টেলিগ্রামের উদ্ধৃতি, দ্র. মাইকেল ব্রেচার; পৃ. ৭৮-৭৯

আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যায়।'[৮৮] আন্দোলনের বহু বছর পরে আমেরিকান লেখক লুই ফিশার এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'গান্ধিজির একটি মাত্র কথায় ভারতবর্ষ বিদ্রোহে ফেটে পড়তে পারে। সে কথাটি বলা হলো না।' মাইকেল ব্রেচার লিখছেন—

> তাঁর অনুগামীদের কাছে গান্ধিজির কাজ আরো বেশি পরিতাপের বিষয় হয়েছিল এই কারণে যে, যখন তিনি এটা ঘটালেন, তখন আশা আরো উজ্জ্বল হচ্ছিল এবং দেশময় আন্দোলন আরো অগ্রগতি লাভ করেছিল।[৮৯]

একটি বিপ্লবী আন্দোলনের পেছনে যে সাংগঠনিক শক্তি সক্রিয় থাকে, বিপ্লবের সাফল্যের ধাপে ধাপে সেই সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা অর্জনের ভেতর দিয়ে। অসহযোগ আন্দোলন যে পিছু হঠছিল এমন প্রমাণ অন্তত তখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

গান্ধিবাদের মধ্যে শ্রম ও পুঁজির সংঘর্ষের বদলে যে সমঝোতার কথা বলা হয়ে থাকে তার সম্যক তাৎপর্য গোড়ার দিকে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বিশেষ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই অসহযোগ আন্দোলনের মতো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারাবলিকে স্বীকার করে নিয়ে দক্ষিণপন্থিরা যখন (বোম্বাই, ১৯১৮) কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং গঠন করলেন নতুন দল 'লিব্যারেল ফেডারেশন' তখন ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী শ্রেণির একটি বিরাট অংশ যে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁর পূর্বোল্লিখিত টেলিগ্রামে ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব রেখেছিলেন, এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বোম্বাই এবং কলকাতার ব্যবসায়ী শ্রেণিদের যেন উত্তেজিত করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, গান্ধিজি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের তিন বছরের মধ্যে ১৯১৮ সালে আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিক ও মালিকের বিবাদে শ্রমিকের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করেন। মজুরি বৃদ্ধিকে সমর্থন করে আমৃত্যু অনশন করেন। অনশনের চতুর্থ দিনে মালিক শ্রমিকদের মজুরি শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। আবার গুজরাট প্রদেশে খয়রার কৃষকরা খরার দরুণ খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে তিনি তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

---

৮৮. উদ্ধৃতির জন্য; মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১৫৯।

৮৯. মাইকেল ব্রেচার, পৃ. ৭৮। লুই ফিসারের উদ্ধৃতি; দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১৫৭।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, গান্ধিজি কোন্ বিপদের সংকেত দেখে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। তিনি অবশ্য তাঁর বক্তব্যে হিংসার বহিঃপ্রকাশকে দায়ী করেছিলেন—সে হিংসার ঘটনা বিচ্ছিন্ন আকারে এত বড়ো দেশজোড়া আন্দোলনের মধ্যে কোথাও ঘটবে না এটা নিশ্চয় তাঁরও অবিদিত ছিল না। আসলে সমগ্র আন্দোলনটি ছিল তাঁর কাছে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। গান্ধিজির ভূমিকা ছিল এক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর মতো। যিনি গবেষণাগারে বহু পরিশ্রমে রোগ মুক্তির ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। ব্যাপকভাবে প্রয়োগের পূর্বে সীমিত আকারের পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে চান তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। ভারতবর্ষে গান্ধিজির পূর্বে গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক কেউ দেননি। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নামার পূর্বে গান্ধিজি এ সম্পর্কে দীর্ঘ চিন্তা করেছেন, শিক্ষা নিয়েছেন বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট প্রমুখ মহা-পুরুষদের জীবন ও বাণী থেকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট্ট এক অঞ্চলে সত্যাগ্রহ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের মতো বিরাট জনবহুল দেশে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে বাস্তবে গান্ধিজির নিকট একটি নিতান্ত শিক্ষাগত চর্চার চেয়ে অধিক কিছু ছিল না। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে বাংলাদেশে ১৯২৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় 'বয়কট' আন্দোলন করা হয়েছিল। কিন্তু 'বয়কট' বা 'বর্জনে'র মধ্যে সংঘর্ষের মনোভাবটি যতটা প্রাধান্য পায়, অসহযোগের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। এখানে যেন শর্তসাপেক্ষ একটা সহযোগিতার কথা উহ্য থেকেই যায়। তাই বর্জনের ভেতর দিয়ে যত সহজে বিলাতি বস্ত্র অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা যায় তত সহজে অসহযোগের ডাকে কোনো চরম ভূমিকা নেওয়া যায় না। আন্দোলনের শুরু থেকেই গান্ধিজি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় ইংরেজ শাসকদের কড়া সমালোচনা করলেও তাঁদের শুভবুদ্ধির উপর একেবারে আস্থা হারাননি। এই কারণে আন্দোলনের চরম মুহূর্তেও দেখা যায় গান্ধিজি ১৯২১ সালের মে মাসের ১৩ তারিখ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে ছ'বার ভাইসরয় লর্ড রিডিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনায় বসেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এই সাক্ষাৎকারগুলি ঘটেছে গান্ধিজির আবেদনের ফলে—ভাইসরয়ের তরফ থেকে নয়।[৯০] এ ছাড়া যে 'স্বরাজ'-এর আন্দোলন তার লক্ষ্য সে 'স্বরাজ' তার বর্ণনা মতে 'যদি সম্ভব হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে—প্রয়োজন

---

৯০. মজুমদার; ৩য় খণ্ড; পৃ. ১১৬।

হলে তার বাহিরে, লাভ করতে হবে।[৯১] প্রকৃতপক্ষে 'স্বরাজ' এর অর্থ যে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'—এটি জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের লাহোর অধিবেশনে। সুতরাং সমস্ত আন্দোলনের মধ্যেই নেতৃত্বের তরফে একটা প্রাথমিক দ্বিধাগ্রস্ততা জড়িয়েছিল। আসলে গান্ধিজি চেয়েছিলেন আন্দোলনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা 'শকথেরাপি'র মতো ব্যবহার করতে। এটি বোঝা যায় তাঁর বিচারকালীন জবানবন্দি থেকে। যে সমস্ত ইংরেজ ও ভারতীয় কর্মচারী তখনো পর্যন্ত সৎভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা এদেশকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে শাসন করছেন এবং ভারতের অগ্রগতি ঘটছে— তিনি চেয়েছিলেন তাঁদের সামনে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে— দেখুক তাঁরা কীভাবে পশুশক্তির হাতে এদেশের লোক লাঞ্ছিত হচ্ছে।[৯২]

কিন্তু তা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ ইতিহাসের এক সুবর্ণ-সুযোগ হারালো।

পুনশ্চ— ইতিমধ্যে তুরস্কে ক্ষমতা দখল করেন কামাল আতাতুর্ক। ১ নভেম্বর, ১৯২২, সুলতানের পদ বিলোপ করা হলো। ১৭ নভেম্বর অটোম্যান সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ কনষ্ট্যান্টিনোপল থেকে প্রাণভয়ে পালালেন। কিন্তু ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তুরস্কের জাতীয় মহাসভা খোদ খলিফার পদেরই অবসান ঘটালো। খলিফা ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হলো এবং তাঁদের সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলো।

---

৯১. In the constitution that had presented, the goal of the Congress was the attainment of Swaraj withhin the Btitish Empire. if possible and without if necessary. অ্যান অটোবায়োগ্রাফি পৃ. ৩০৬।

৯২. গান্ধিজির বিচারকালীন জবানবন্দি; দ্র. বিপানচন্দ্র; পৃ. ২৭৬।

প্রয়োজনীয় নোট

প্রয়োজনীয় নোট



আদর্শলিপি প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য কিছু বই

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক	মূল্য
১.	ভারত কী করে ভাগ হলো	বিমলানন্দ শাসমল	৩৫০/-
২.	স্বাধীনতার ফাঁকি	বিমলানন্দ শাসমল	৩০০/-
৩.	আর এস এস ও বর্তমান ভারত	গৌতম রায়	৭০০/-
৪.	স্মৃতির পাতা থেকে	পি এ নাজির	৪৯০/-
৫.	ইতিহাস কথা কয়	মোহাম্মদ মোদাব্বের	৪৫০/-
৬.	পথনাটক সমগ্র	মান্নান হীরা	৬৫০/-
৭.	বিপ্লবী নবী (স.)	আল্লামা আজাদ সুবহানী	৩৫০/-
৮.	কথামালার রাজনীতি	ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী	৩৫০/-
৯.	ছড়ায় ইসলামি জীবন	শেখ ফজলুর রহমান	১৫০/-
১০.	ওয়াহাবী থেকে খিলাফত	ড. শ্যামাপ্রসাদ বসু	২৬০/-
১১.	শহীদ তিতুমীর	আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	৩০০/-
১২.	ওমরের রুবাই	পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য	৪৫০/-
১৩.	মহাকাব্য ও মৌলবাদ	জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫০/-
১৪.	কালাম-ই-ইকবাল	আল্লামা ইকবাল	২৫০/-
১৫.	বাল-ই-জিবরীল	আল্লামা ইকবাল	২৫০/-
১৬.	আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বাঙালি মুসলমান	গৌতম রায়	৪০০/-
১৭	আমার বেড়ে ওঠা	শাহ্‌জাহান কিবরিয়া	৪০০/-
১৮	আমি 'ঋ' লিখতে পারি না	শাহ্‌জাহান কিবরিয়া	১৫০/-


আদর্শ
লিপি



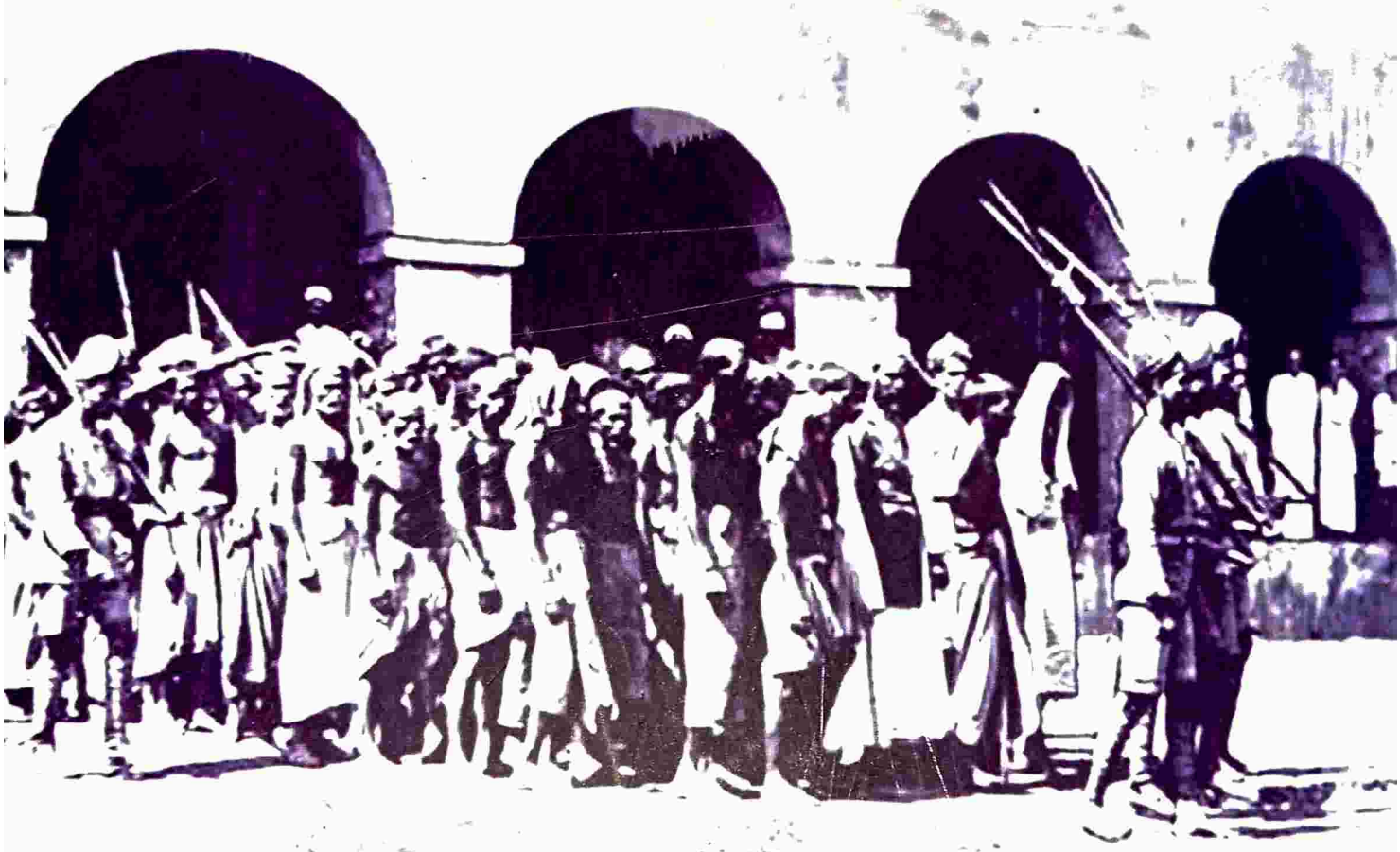
শ্যামাপ্রসাদ বসু। অধ্যাপক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক। জন্ম ১৯৩৪ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক শহরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে (ডবল) এম.এ. (ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) এবং রিসার্চ স্কলার। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি, এরপর রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময়ের জন্য অধ্যাপক ও পরীক্ষক ছিলেন। খড়গপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজের প্রাক্তন রিডার। কিছু সময়ের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক ও পরীক্ষক।

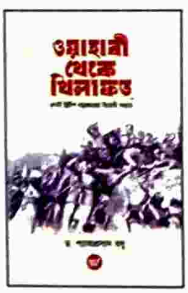
বাংলায় ইতিহাস বিষয়ক সর্বাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ব্যারাকপুর সম্মেলনে মধ্যযুগের শাখার সভাপতিত্ব করেন। সরকারি বেসরকারি বহু জনহিতকর শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। পুরুলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি। প্রায় ৩৭টি বই লিখেছেন। ইসলামের ইতিহাসের একজন অথরিটি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

মেদিনীপুর জেলা চতুর্দশ বইমেলা (২০০২) কমিটি কর্তৃক সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত।

প্রচ্ছদ : আল-নোমান

'পলাশীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইবের খঞ্জর'। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারালো। ক্লাইভের খঞ্জর মীরমদন আর মোহনলালের মধ্যে তফাত করলো না। রচিত হলো হিন্দু-মুসলমানের মেল-বন্ধন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালের জাতীয় স্বাধীনতার লড়াইতে উভয় সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া নেতারা এই মেল-বন্ধনকে একবারে ছিন্ন না করলেও দৃঢ় করতে ব্যর্থ হলেন। ফলশ্রুতি– বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং চূড়ান্ত পরিণতি খণ্ডিত উপমহাদেশ। কিন্তু তাতেও এই কর্কট রোগের উপশম ঘটেনি। মূলের বিষ কখনোই উৎখাত হয়নি।





Wahabi Theke Khilafat
by Dr. Shyamaprasad Basu

Published by **Adarshalipi**
B-35, Concord Emporium Shopping Complex
253-254 Elephant Road, Kantabon, Dhaka-1205
Price: BDT 260.00

9 789843 479648

adarshalipi2018@gmail.com | www.adarshalipi.com | 01840-953954, 01733-773337